পাক্ষিক আহ্‌মদী

নব পর্যায় ৫৯ বর্ষ ॥ ১৪শ সংখ্যা | ঈদ সংখ্যা | ৩১শে জানুয়ারী, ১৯৯৮

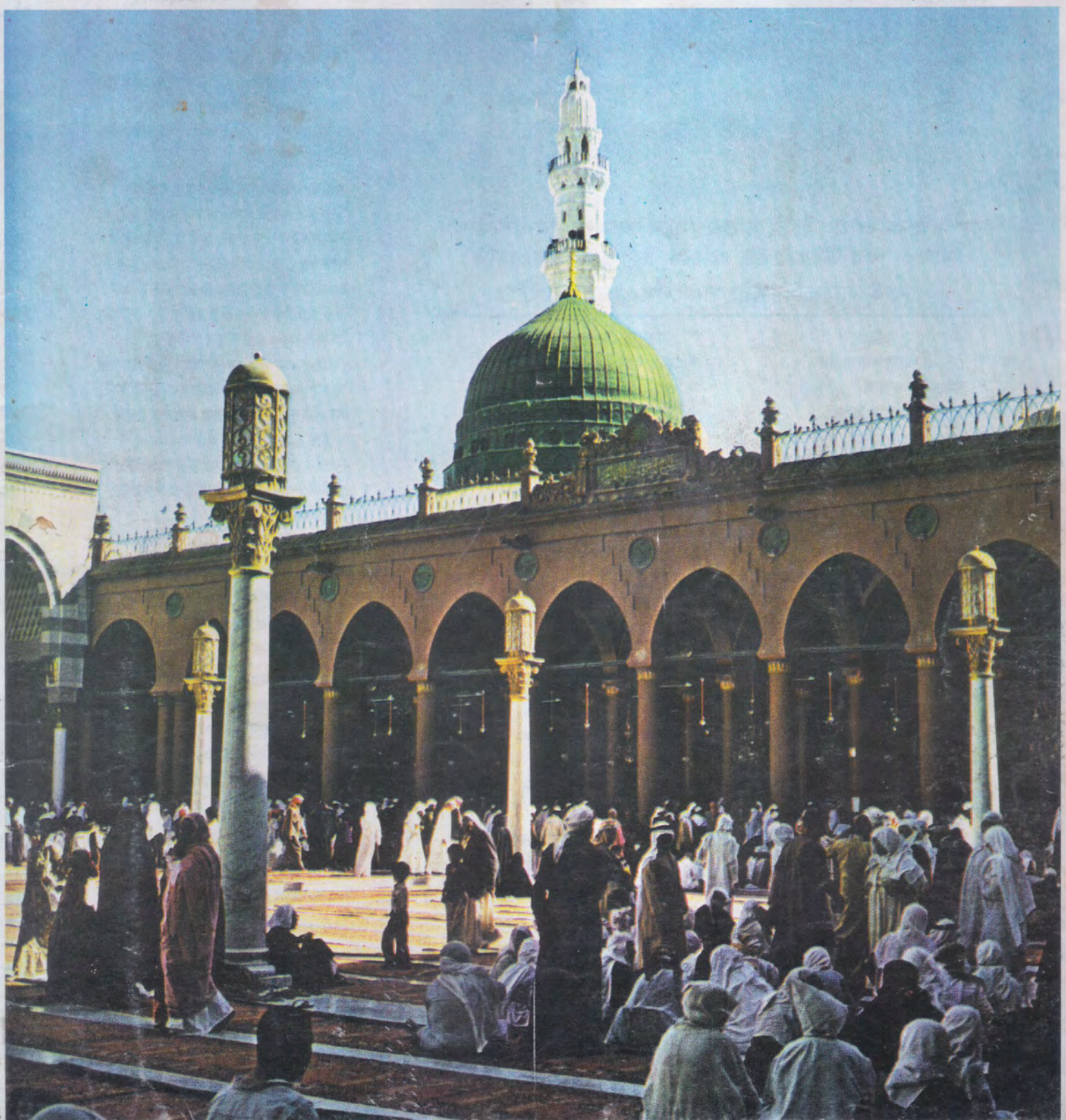

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পাক্ষিক আহমদী'র মানোন্নয়নে আমরা আনন্দিত। আমরা এর উত্তরোত্তর আরো উন্নতি কামনা করি।

একই সাথে আমরা সকলের দোয়া প্রার্থী ঃ

* মিসেস মুখতার বানু
* সৈয়দা আমাতুল মজীদ
* কাওসার জাহান
* ইশরাত জাহান মঞ্জুর
* মোবারেকা বেগম
* শাহেদ আহমদ * রাশেদ আহমদ
* তাহের আহমদ * মঞ্জুর আহমদ
* সৈয়দা শামসুন্নেসা
* নাসিরা আক্তার
* তানিয়া খান
* নাজমা রহমান (দিপা)
* রুমানা খান
* ডাঃ তামান্না খান
* আয়েশা ইশরাত
* রাকিবা আক্তার
* জামিউল আলম আতাহার
* বদরাতুন আনোয়ারা বেগম
* তাহেরা মির্যা
* মোহাম্মদ আশরাফ
* মোহাম্মদ আবুল খায়ের
* নেসার আহমদ * নাসির আহমদ
* আমাতুর রশীদ
* ফরিদ আহমদ * মনসুর আহমদ
* প্রিন্সিপ্যাল মোনেম বিল্লাহ
* মির্যা মোহাম্মদ আলী
* মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক
* তাহমুদা বেগম
* ডাঃ মেজর আসাদ উজ্জামান (অবঃ)
* এম, আরিফ উজ্জামান
* মিসেস রওশন আরা (সুচী)
* মাষ্টার রাসেল আহমদ
* মীর বশীরুদ্দিন মাহমুদ
* জিনাত জাহান মুনমুন
* মাহবুবা আক্তার লুসী
* মীর হাসান আলী নিয়াজ
* জিন্নাতুন্নাহার
* মীর দাউদ আহমদ
* মীর মোবাশ্বের আলী
* মীর শাব্বির আহমদ
* মীর মোহাম্মদ শফী * নসিবা বানু
* মীর মুজাহিদ আলী
* মোহাম্মদ নূরুজ্জামান
* কে আজিজ আহমেদ
* মোহাম্মদ সামসুর রহমান
* হোসনে আরা বেগম
* মোহাম্মদ আবু বকর আকন্দ
* মোহাম্মদ মাহবুব আজম রেজা
* রফিক আহমদ
* রাবেয়া আহমদ
* মোহাম্মদ ইব্রাহীম হোসেন
* আমাতুল হাই

দীর্ঘ এক মাস সিয়াম সাধনার পর এসেছে পবিত্র ঈদুল ফিতর। এ উপলক্ষে আমি সকল আহমদী এবং বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণকে জানাই আমার আন্তরিক ঈদ মুবারক ও শুভেচ্ছা।

আমরা এবার এমন এক প্রেক্ষাপটে ঈদ উদযাপন করছি যখন আমাদেরকে 'অমুসলমান' ঘোষণার দাবী উঠেছে এদেশের কতিপয় মোল্লা-মৌলবীদের তরফ থেকে। সত্য-মিথ্যা যাচাইয়ের জন্যে তাই নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বর্তমান ইমাম হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)-এর পক্ষ থেকে আমি বাংলাদেশের আহমদীয়তের বিরোধিতায় নেতৃত্বদানকারী আলেমদেরকে মুবাহালার চ্যালেঞ্জ প্রদান করেছি। দোয়া করুন আল্লাহ যেন ঐশী নিদর্শন দেখান এবং আহমদীয়তের সত্যতা প্রকাশিত হয় যাতে মানুষের হেদায়াতের কারণ হয়।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যে সব মুসলমান ভাইয়েরা বিশেষ করে আহমদীরা যুলুম-অত্যাচারের শিকার হচ্ছেন, তাদের সকলের দুঃখ ও বেদনার সাথে আমরা একাত্মতা ঘোষণা করছি।

আজ এ আনন্দঘন মুহূর্তে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, আমাদের প্রকৃত ঈদ ও আনন্দ তখনই লাভ হবে যখন সারা দুনিয়ার মানুষ এক নেতা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর অধীনে সত্যিকারের ইসলামের ছায়াতলে সমবেত হবে।

আমাদের ঐকান্তিক দোয়া সেই শুভ দিন যেন আমরা শীঘ্রই দেখার সৌভাগ্য লাভ করি।

ওয়াস্‌সালাম।

দোয়াপ্রার্থী,

আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী
ন্যাশনাল আমীর

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

পাক্ষিক আহমদী

নব পর্যায় ৫৯ ॥ ১৪শ সংখ্যা

১৮ মাঘ ১৪০৪ বঙ্গাব্দ ❑ ২ শওয়াল ১৪১৮ হিঃ কাঃ
৩১শে সুলাহ্ ১৩৭৭ হিঃ শাঃ ❑ ৩১ জানুয়ারী ১৯৯৮ ঈসাব্দ

বার্ষিক চাঁদা ঃ বাংলাদেশ টাঃ ১৫০ ❑ অন্যান্য দেশে £ 50/ $ 100

সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি
আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী

সম্পাদক
মকবুল আহমদ খান

সহকারী সম্পাদক
মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

বার্তা সম্পাদক
মোহাম্মদ আবদুল জলীল

প্রচার সম্পাদক
ডাঃ মুহাম্মদ সেলিম খান

শিল্প নির্দেশক
মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন

সহকারী শিল্প নির্দেশক
সালাহ উদ্দীন আহমদ

বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি
আব্দুল আউয়াল ইমরান

হিসাব ব্যবস্থাপক
মোহাম্মদ শামসুর রহমান

সহকারী হিসাব ব্যবস্থাপক
গিয়াসুদ্দীন আহমদ

বৈদেশিক বিষয়ক উপদেষ্টা
এ, কে, রেজাউল করীম

বিদেশ প্রতিনিধি

মুহাম্মদ আব্দুল হাদী	-	লন্ডন, ইউ কে
ইসমত পাশা	-	কানাডা
মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	-	নিউ ইয়র্ক
জাভেদ এ, মতিন	-	ক্যালিফর্নিয়া
আব্দুর রব	-	জার্মানী
কাউসার আহমদ	-	হল্যান্ড
এন, এ, শামীম	-	বেলজিয়াম
ইসমত উল্লাহ	-	জাপান
মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম	-	হংকং

তত্ত্বাবধানে ঃ সেক্রেটারী পাবলিকেশন

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহমদীয়া আর্ট প্রেস, ৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ফোন ঃ ৫০১৩৭৯, ৫০৫২৭২ ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৮৬৩৪১৪

সম্পাদকীয়

প্রকৃত ঈদ

আমরা আমাদের অগণিত পাঠক-পাঠিকা ও শুভানুধ্যায়ীগণকে জানাই পবিত্র ঈদুল ফিতরের শুভেচ্ছা ও মুবারকবাদ। এ ঈদ সকলের জন্যে কল্যাণ বয়ে নিয়ে আসুক।

পবিত্র মাহে রমযানের রহমত, মাগফেরাত ও নাজাতের দিনগুলো একে একে চলে যাচ্ছে আর পবিত্র ঈদুল ফিতরের শওয়ালের এক ফাঁলি ঈদের বাঁকা চাঁদ সমগ্র মুসলিম উম্মাহ্‌কে বলবে আস, ঈদ করো, আনন্দ–স্ফূর্তি করো। অথচ আনন্দ-স্ফূর্তি কীসের তা ভেবে দেখার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। এ আনন্দ-স্ফূর্তি কি নতুন জামা-কাপড় পরার আর সেমাই-জর্দা খাওয়ার, না রমযানের বোঝা আমাদের কাঁধ থেকে নেমে গেছে সে জন্যে। নাকি বড় লোকেরা ভাল ভাল দামী দামী কাপড়-চোপড় পরে ঈদের খুশীতে ভরপুর হয়েছে আর কতগুলো লোক নগ্ন দেহে, ভগ্ন স্বাস্থ্যে বাড়ী বাড়ী ঘুরছে আর বলছে মা গো ! খাবার দিবেন? ফেতরা দিবেন - এজন্যে ? নাকি এজন্যে যে, পবিত্র আরব ভূমি ইহুদী নাসারা নর-নারী কর্তৃক দলিত-মথিত হয়েছে, অথবা প্যালেষ্টাইনে মুসলমানগণ ইহুদী কর্তৃক নিগৃহিত হচ্ছে বা মুসলমানগণ আপোষে লেবানন আফগানিস্তান প্রভৃতি স্থানে লড়ছে আর ভাই ভাই-এর রক্তে খুশীতে আটখান হচ্ছে। খুব গভীরভাবে ভাবতে গেলে এ খুশী কি এ রকম নয় যে, কারও ঘরে মৃত পড়ে রয়েছে আর তারা আনন্দ স্ফূর্তিতে মশগুল ?

ঈদ অর্থ যে খুশী বার বার আসে - হযরত ঈসা (আঃ)-এর জাতির জন্যে দু'বার এসেছিল। প্রথমতঃ আওয়ালীনদের জন্যে, যারা প্রায় তিন শতাধিক বছর ঈমানের সম্পদকে রক্ষা করার জন্যে মাটির গুহায় কঠোর জীবন-আসহাবে কাহাফের জীবন যাপন করেছিলেন। তাঁরাও নিঃসন্দেহে একটা ঈদের আনন্দ উপভোগ করেছিলেন। আখেরীনদের মধ্যে অর্থাৎ রোমান সম্রাট কনষ্ট্যান্টাইনের খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করার পর থেকে বিশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে পর্যন্ত হযরত মসীহ নাসেরী (আঃ)-এর দোয়ার বরকতে (সূরা মায়েদা-১১৫) খৃষ্টানগণ ঈদ উপভোগ করে। তারা দুনিয়াতে প্রভুত্ব বিস্তার করে এবং অর্থনৈতিক মুক্তি লাভ করে। এমনকি সারা দুনিয়ার রিযিকের ভান্ডার অর্থাৎ হাদীসে বর্ণিত 'রুটির পাহাড়ে'র মালিক বনে এক প্রকার ঈদ লাভ করে।

প্রাথমিক যুগে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এবং পরে খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগেও মুসলমানগণ এক প্রকার ঈদ আস্বাদন করেছিলেন। কিন্তু 'ফাইজে আওয়াজের' (বক্র-পথভ্রষ্টতা) যুগে তারা ঈদ থেকে বঞ্চিত হয়। 'মুহাম্মদী মসীহ' (আঃ)-এর যুগে ইসলামের বিশ্ব বিজয়ের মাধ্যমে মুসলমানদের মধ্যে পুনরায় 'খেলাফতে 'আলা মিন হাজিন নবুওয়ত-এর পদ্ধতিতে খেলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পুনরায় মুসলমানগণ ঈদের প্রকৃত আনন্দ উপভোগ করবে বলে কুরআন এবং হাদীসের আলোকে জ্ঞাত হওয়া যায়। আল্লাহ্‌তাআলার ফযলে আহমদীয়া খেলাফতের মাধ্যমে সে কর্মকান্ড শুরু হয়েছে। বিশ্ব মুসলিম যত শীঘ্র সে খেলাফতকে গ্রহণ করে তাদের অনৈক্য দূর করে ঐ এলাহী কর্মকান্ডের সাথে তাদেরকে সম্পৃক্ত করবে তত শীঘ্র তারা সেই প্রতিশ্রুত 'প্রকৃত ঈদ'কে প্রত্যক্ষ করবে এবং দুনিয়াতে তখন পুনরায় আল্লাহ্‌তাআলার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। আর তখন ধর্ম বলতে ইসলামকেই বুঝাবে ও নেতা বলতে বুঝাবে আমাদের প্রিয় প্রভু ও নেতা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে। আমরা সেই প্রকৃত ঈদের প্রতীক্ষায় রয়েছি।

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃঃ
❑ কুরআন মজীদ (তফসীর সহ)	ঃ 'কুরআন মজীদ' থেকে	৩
❑ হাদীস শরীফ	ঃ অনুবাদ ও ব্যাখ্যা–মাওলানা সালেহ আহমদ	৪
❑ ঈদের বাণী ঃ সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহের্ রাবে' (আইঃ)	ঃ অনুবাদ-মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ	৪
❑ অমৃতবাণীঃ হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) 'রোয়েদাদ জলসা দোয়া' পুস্তক থেকে	ঃ অনুবাদ-সাহেবুল কাহ্‌ফ	৫
❑ হাকীকাতুল ওহীঃ মূল হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ)	ঃ অনুবাদ-নাজির আহমদ ভূঁইয়া	৬-১০
❑ ঈদুল ফিতর-এর খুৎবা ঃ সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহের্ রাবে' (আইঃ)	ঃ অনুবাদ-মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	১১-১৫
❑ ইনকিলাবে হাকীকী (প্রকৃত বিপ্লব) মূলঃ হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ সানী, আল্ মুসলেহুল মাওউদ(রাঃ)	ঃ অনুবাদ-মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	১৬-১৭
❑ খতমে নবুওয়ত ও আহ্‌মদীয়া জামাত মূলঃ আল্লামা কাযী মুহাম্মদ নাযীর লায়েলপুরী	ঃ ভাষান্তর-এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার (মরহুম)	১৮
❑ আমার বয়াত গ্রহণের পটভূমি ঃ মওলানা গোলাম রসূল রাজেকী (রাঃ)	ঃ অনুবাদ শেখ হেলাল উদ্দীন আহমদ	১৯-২০
❑ রোযার কিছু তত্ত্ব-কথা ঃ সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহের্ রাবে' (আইঃ)	ঃ অনুবাদ -মাওলানা বশীরুর রহমান	২১-২৬
❑ ছোটদের পাতা (রোযা সম্পর্কে জ্ঞাতব্য)	ঃ পরিচালক-মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	২৭-২৯
❑ সালানা জলসায় আগমনের গুরুত্ব ঃ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)	ঃ অনুবাদ : মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	৩০-৩১
❑ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর একটি মহান ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা	ঃ	৩২

পাক্ষিক আহমদী

বিজ্ঞাপনের হার

	সাধারণ (সাদাকালো)	দুই রং	চার রং
শেষ প্রচ্ছদ	টাকা ১০,০০০/=	টাকা ১২,০০০/=	টাকা ১৫,০০০/=
২য় ও ৩য় প্রচ্ছদ	টাকা ৮,০০০/=	টাকা ১০,০০০/=	টাকা ১২,০০০/=
সাধারণ পূর্ণ পাতা	টাকা ৫,০০০/=	টাকা ৭,৫০০/=	টাকা ১০,০০০/=
সাধারণ অর্ধ পাতা	টাকা ৩,০০০/=	টাকা ৫,০০০/=	টাকা ৭,০০০/=
প্রতি কলাম ইঞ্চি	টাকা ৫০০/=	.....	.....

কারিগরি তথ্য ঃ ❑ প্রতি ইংরেজী মাসের ১৫ এবং শেষ তারিখ প্রকাশিত হয়। মুদ্রণ মাপ-পূর্ণ পাতা ৯″ × ৬.৭৫″
❑ অর্ধ পাতা ৮.৫০″ × ৬.৭৫″ কলামের মাপ ৩.২০″

বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি

কুরআন মজীদ

সূরা আন্ নাস-৪

১৩১। এবং যদি তাহারা একে অপর হইতে পৃথক হয় তাহা হইলে আল্লাহ্ (তাহাদের মধ্যে) প্রত্যেককে নিজ নিজ পক্ষ হইতে প্রাচুর্য দিয়া স্বনির্ভরশীল ৬৮১ করিয়া দিবেন, বস্তুতঃ আল্লাহ্ প্রাচুর্যদাতা, প্রজ্ঞাময়।

১৩২। এবং যাহা কিছু আকাশমণ্ডলে আছে এবং যাহা কিছু পৃথিবীতে আছে সবই আল্লাহ্‌র। এবং যাহাদিগকে তোমাদের পূর্বে কিতাব দেওয়া হইয়াছিল তাহাদিগকেও এবং তোমাদিগকেও আমার এই তাকিদপূর্ণ নির্দেশ দিয়াছি যে, তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর ; কিন্তু যদি তোমরা অস্বীকার কর তাহা হইলে (স্মরণ রাখিও) যাহা কিছু আকাশমণ্ডলে এবং যাহা কিছু পৃথিবীতে আছে সবই আল্লাহ্‌র, বস্তুতঃ আল্লাহ্ মহা ঐশ্বর্যশালী, প্রশংসাভাজন।

১৩৩। এবং যাহা কিছু আকাশমণ্ডলে আছে এবং যাহা কিছু পৃথিবীতে আছে সবই আল্লাহ্‌র এবং কার্যনির্বাহক হিসাবে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।

১৩৪। হে মানবমণ্ডলী ! যদি তিনি চাহেন তাহা হইলে তিনি তোমাদিগকে অপসারিত করিতে পারেন এবং (তোমাদের স্থলে) অন্যদেরকে লইয়া আসিতে পারেন এবং আল্লাহ্ ইহা করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম।

১৩৫। যে কেহ ইহকালের পুরস্কার চাহিবে তাহা হইলে (সে যেন স্মরণ রাখে যে,) আল্লাহ্‌র নিকট ইহকাল ও পরকালের পুরস্কার রহিয়াছে এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। (১৯ রুকূ)

১৩৬। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! তোমরা ন্যায়পরায়ণতার উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হও আল্লাহ্‌র জন্য সাক্ষী হিসাবে, যদিও (তোমাদের সাক্ষ্য) তোমাদের৬৮২ নিজেদের বা পিতামাতার এবং স্বজনগণের বিপক্ষে যায়। (যাহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়া হইবে) যদি সে ধনী হয় অথবা দরিদ্র, তাহা হইলে আল্লাহ্ তাহাদের উভয়েরই সর্বাধিক শুভাকাঙ্খী। সুতরাং তোমরা হীনকামনার অনুসরণ করিও না যাহাতে তোমরা ন্যায়বিচার৬৮২-ক করিতে পারে। এবং যদি তোমরা কথা পেঁচাইয়া (সত্যকে) গোপন কর অথবা এড়াইয়া যাও তাহা হইলে (জানিয়া রাখ যে,) তোমরা যাহা কিছু কর তদ্‌সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত আছেন।

১৩৭। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ!৬৮৩ তোমরা ঈমান আন আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলের উপর এবং এই কিতাবের উপর যাহা তিনি স্বীয় রসূলের উপর নাযেল করিয়াছেন এবং সেই কিতাবের উপরও যাহা তিনি পূর্বে নাযেল করিয়াছেন; এবং যে আল্লাহ্ এবং তাঁহার ফিরিশ্‌তাগণ এবং তাঁহার কিতাবসমূহ এবং তাঁহার রসূলগণ এবং শেষ দিবসকে অস্বীকার করে সে অবশ্যই চরমভাবে পথভ্রষ্ট হইল।

১৩৮। নিশ্চয় যাহারা ঈমান আনে অতঃপর অস্বীকার করে পুনরায় ঈমান আনে, এবং অস্বীকার করে এবং অস্বীকারে তাহারা বাড়িয়া যায় ৬৮৪ আল্লাহ্ কখনও তাহাদিগকে ক্ষমা করিবেন না এবং তাহাদিগকে (সঠিক) পথে পরিচালিত করিবেন না।

১৩৯। মোনাফেকদিগকে শুভ সংবাদ দাও যে, নিশ্চয় তাহাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রহিয়াছে;

১৪০। যাহারা মো'মেনগণকে ছাড়িয়া কাফেরদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তাহারা কি তাহাদের নিকট ইজ্জতের আকাঙ্খা করে ? তাহা হইলে (তাহারা জানিয়া রাখুক যে,) সমস্ত ইজ্জত অবশ্যই আল্লাহ্‌র ইখতিয়ারভুক্ত।

১৪১। এবং তিনি অবশ্যই তোমাদের জন্য এই কিতাবে ৬৮৫ নাযেল করিয়াছেন যে, যখন তোমরা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ সম্বন্ধে শুন যে ঐগুলিকে অস্বীকার করা হইতেছে এবং উহাদের প্রতি বিদ্রূপ করা হইতেছে তখন তাহাদের সহিত বসিও না যে পর্যন্ত না তাহারা উহা ছাড়া অন্য কথায় রত হয়, নচেৎ তোমরা অবশ্যই তাহাদের অনুরূপ হইবে৬৮৬। নিশ্চয় আল্লাহ্ সকল মোনাফেক এবং কাফেরকে জাহান্নামে একত্রিত করিবেন;

১৪২। যদি আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে তোমাদের কোন বিজয় লাভ হয় তাহা হইলে যাহারা তোমাদের ধ্বংসের অপেক্ষা করিতেছে তাহারা বলে, 'আমরা কি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম না?' এবং যদি কাফেররা (বিজয়ের) কোন অংশ পায় তখন তাহারা (কাফেরদিগকে) বলে, 'আমরা কি (পূর্বে) তোমাদের উপর জয়যুক্ত হই নাই এবং আমরা কি তোমাদিগকে মো'মেনদের হাত হইতে রক্ষা করি নাই?' সুতরাং আল্লাহ্ তোমাদের মধ্যে কিয়ামতের দিন ফয়সালা করিবেন এবং আল্লাহ্ কাফেরদিগকে মো'মেনদের উপর কখনও আধিপত্য দিবেন না। (২০ রুকূ) (চলবে)

৬৮১। স্বামীর তরফ হইতে পূর্ণ প্রচেষ্টা এবং স্ত্রীর পক্ষ হইতে পূর্ণ প্রচেষ্টা চালাইবার পরেও যদি তাহারা কোন মতেই শান্তিপূর্ণভাবে একত্রে বাস করিতে সক্ষম না হয় এবং তাহাদের তালাক (বিবাহ-বিচ্ছেদ) ঘটিয়া যায়, তাহা হইলে, আল্লাহ্ বলিতেছেন, তিনিই তাহাদের জন্য উত্তম পাত্র ও পাত্রী জোটাইয়া দিবেন। তবে ইসলামের মতে, "আল্লাহ্‌র কাছে, সকল হালাল কাজের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ঘৃণ্য কাজ হইল তালাক" (আবূ দাউদ, তালাক অধ্যায়)।

৬৮২। আরবীতে "তোমাদের নিজেদের বিরুদ্ধে" বলিতে বুঝায় "তোমাদের নিজের লোকজন, আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে"। তাহা সত্ত্বেও নির্দেশটির উপর সবিশেষ জোর দিবার জন্য "পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন" শব্দগুলিও যোগ করা হইয়াছে।

৬৮২-ক। এই শব্দগুলির অর্থ ইহাও হইতে পারে – পাছে যদি তোমরা পদস্খলিত হও।

৬৮৩। হে ব্যক্তিগণ ! তোমরা যাহারা নিজেদেরকে মো'মেন বল, তোমরা নিজের আচার-আচরণ ও কর্মদ্বারা তোমাদের ঈমানের স্বচ্ছতা ও দৃঢ়তা প্রমাণ কর।

৬৮৪। "মুরতাদ বা ধর্মত্যাগীদের জন্য ইসলাম মৃত্যুদণ্ডের বিধান রাখিয়াছে" – আয়াতটি এই ভিত্তিহীন অপবাদকে খণ্ডন করিতেছে।

৬৮৫। "তিনি অবশ্যই তোমাদের জন্য এই কিতাবে নাযেল করিয়াছেন" বাক্যটি ৬ঃ৬৯-এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে যাহা এই আয়াতের পূর্বে মক্কায় অবতীর্ণ হইয়াছিল। তবে, মক্কায় অবতীর্ণ ৬ঃ৬৯ আয়াতটি, আলোচ্য আয়াতের পরে কুরআনে স্থান পাইয়াছে। ইহাতে বুঝা যায়, কুরআনের আয়াতগুলি নাযেল হওয়ার সময়-ক্রম অনুযায়ী সাজানো হয় নাই, বরং বিষয়-বস্তুর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সাজানো হইয়াছে।

৬৮৬। অত্র আয়াতের নির্দেশটি ত্রিবিধ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিতঃ (১) ধর্মীয় বিষয়াদির গুরুত্ব ও গাম্ভীর্যের উপর জোর দেওয়া যাহাতে ব্যাপারটিকে কোনক্রমেই লঘু করিয়া দেখা না হয়, (২) কাফেরদের ক্ষতিকর ও হীন সংসর্গের প্রভাব হইতে মো'মেনগণকে রক্ষা করা, (৩) মুসলমানদের হৃদয়ে ধর্মীয় ব্যাপারে পবিত্র চেতনা ও মর্যাদাবোধ জাগাইয়া তোলা।

হাদীস শরীফ

নিয়্যত

কুরআন :

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ

অর্থাৎ উহাদের মাংস ও উহাদের রক্ত কখনও আল্লাহ্‌র নিকট পৌছে না। বরং তাঁর নিকট তোমাদের তরফ হতে তাকওয়া পৌছে (হাজ্জ – ৩৮)।

হাদীস :

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ اِلَّا مَا كَانَ لَهٗ خَالِصًا وَّابْتُغِيَ بِهٖ وَجْهُهٗ

অর্থাৎ আল্লাহ্‌তাআলা শুধু সেই আমলকে গ্রহণ করে থাকেন যা শুধু তাঁর জন্যে হয় এবং ঐ আমল দ্বারা তাঁর সন্তুষ্টি চাওয়া হয়। (নিসাঈ)

ব্যাখ্যা : কুরআন হতে জানা যায় যে, আল্লাহ্‌তাআলা শুধু মাত্র মানুষের হৃদয়কে অর্থাৎ তার কোন কাজ উপলক্ষ্যে অন্তরের নিয়্যতকে দেখে থাকেন। আল্লাহ্‌তাআলা মানুষের কোন কিছুরই মুখাপেক্ষী নন। মানুষই তার স্রষ্টার মুখাপেক্ষী। তাই স্রষ্টার সন্তুষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন আমল করে থাকে। খোদাতাআলা বস্তুত: সেই আমলেরই মূল বিষয়কে দেখেন। তিনি দেখে থাকেন যে, মানুষ কোন উদ্দেশ্যে এ কর্ম করছে।

হাদীস হতে জানতে পারি যে, আল্লাহ্ শুধু ঐ সকল কর্মের প্রতিদান দিবেন যা শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির লক্ষ্যে করা হয়। উপরোক্ত হাদীসে আমাদিগকে বলা হচ্ছে যে, আমরা যেন আমাদের নিয়্যতকে ঠিক করি নতুবা কর্মের ফল ভালো হবে না। অর্থাৎ সওয়াব পাওয়া যাবে না। অনেকেই এমন রয়েছেন যারা ছিঁড়া কাপড়, খারাপ খাদ্য গরীবদের মাঝে এই বলে বিতরণ করে যে, আমরা আল্লাহ্‌র জন্য দিচ্ছি। কিন্তু তারা ভাবে না দিচ্ছেটা কী ? ছেঁড়া কাপড় ও খারাপ খাবার আল্লাহ্‌র জন্য, আর ভালোটা তাদের জন্য ? এতে নিয়্যত বুঝা যায়। আল্লাহ্‌কে তো ভালো জিনিসটা দিতে হবে। এমন সব কিছু যা তোমরা ভালোবাসো। সুতরাং কর্মের ক্ষেত্রে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে আমরা যেন আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিকে সামনে রেখে এমন কর্ম করি যা খোদা পসন্দ করেন। আল্লাহ্‌তাআলা আমাদিগকে ইহার তৌফীক দিন, আমীন।

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা : মাওলানা সালেহ আহমদ, সদর মুরব্বী

ঈদের বাণী

সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)

(৯ই ফেব্রুয়ারী ১৯৯৭ইং, ইসলামাবাদ (টিলফোর্ড) ইংল্যান্ড - এ প্রদত্ত ঈদের খুৎবার সার সংক্ষেপ)

এবছরটিকে আল্লাহ্‌র 'লেকা' অর্থাৎ সাক্ষাতলাভের বছরে পরিণত করুন। ঐ সমস্ত শত্রু যারা আমাদের ধ্বংসের স্বপ্ন দেখছে তারা যেন নিজেদের ধ্বংস ও ব্যর্থতা প্রত্যক্ষ করে এবং আপনাদেরকে খোদার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হতে দেখতে থাকে।

নিখিল বিশ্ব-আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামাতকে আমি খোদাতাআলার পক্ষ থেকে সালামতির বাণী পৌছাচ্ছি।

রমযানুল মুবারক যে-সব চিরস্থায়ী বরকত ও আশিস রেখে গিয়েছে ওগুলোর অন্যতম হচ্ছে খোদাতাআলার ঐ সকল মুখলেস ও নিষ্ঠাবান বান্দা, যারা 'তৌবাতুন-নসূহ্' অর্থাৎ খাঁটি তৌবার তওফীক লাভ করেছেন। অনেকেই যারা খোদার বান্দা হওয়া সত্ত্বেও প্রকৃতপক্ষে খোদার বান্দাস্বরূপ ছিলেন না, এই রমযানের সুবাদে তারা খোদার প্রকৃত বান্দায় পরিণত হয়েছেন। সুতরাং এই অর্থে আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামাতের জন্য এই রমযান প্রভূত বরকত ও আশিস রেখে যায়। হুযূর বলেন, তেমনি মুবাহালার প্রেক্ষাপটেও যদি ধরা হয়, সে দিক দিয়েও আমার পরিপূর্ণ দৃঢ়বিশ্বাস যে, এই রমযান অত্যন্ত সার্থক ও স্থিতিশীল বরকত ও কল্যাণ রেখে গিয়েছে। অতএব, **আমি নিখিল বিশ্ব-আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামাতকে খোদাতাআলার পক্ষ থেকে সালামতি, শান্তি, নিরাপত্তার বাণী ও সুসংবাদ পৌছাচ্ছি।** তাদের কাছে আমার প্রত্যাশা তারা এর জবাব এই দিবেন যে, "হে আল্লাহ্ আমরা হাযির আছি, আমরা তোমার সালামতির ছত্রছায়ায় আসার জন্য নিজেদেরকে পাক-সাফ করবো এবং সর্বদা নিজেদের আধ্যাত্মিক পবিত্রতা রক্ষায় যত্নবান থাকবো"। এই অঙ্গীকার ও নিয়্যতের সাথে আপনারা যদি সালামতির এ যুগটিতে প্রবেশ করেন, তাহলে এই রমাযান এরূপ কোনও বরকত নেই যা আপনাদের জন্য রেখে না যাবে। রমযানের এই বরকত ও কল্যাণের উল্লেখের পর হুযূর (আইঃ) ঈদুল ফিতরের এই খুৎবাটিতে বিশেষভাবে ইবাদত ও নামায প্রতিষ্ঠার বিষয়ে বিশদ আলোকপাত করে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন যে, এর সুফল অনেক বড় অর্থাৎ আল্লাহ্‌র দর্শন ও সাক্ষাতলাভ। কেননা, তার সমীপেই আমাদেরকে উপস্থিত হতে হবে। কাজেই **এই উপলক্ষ্যে ইবাদত প্রতিষ্ঠাই হচ্ছে আমার পয়গাম।** আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের ওসীলাতেই আমরা এই সুফল পেয়েছি এবং তাঁরই গোলামীতে আমরা সমগ্র বিশ্ববাসীকে আঁ হুযূর (সাঃ)-এর শান্তি ও নিরাপত্তার দুর্গে প্রবেশ করাতে সর্বতঃ সচেষ্ট রয়েছি। "কাজেই আপনাদেরকে লেকা-এ-ইলাহী হাসিল করতে হবে"। এতদ্ব্যতিরেকে আপনারা আঁ হুযূর (সাঃ)-এর পয়গাম পৌছাতে পারেন না।

হুযূর বলেন, জগদ্বাসীর আজ আল্লাহ্‌র সাক্ষাতলাভে ধন্য চেহারাগুলো দেখাবার প্রয়োজন। খোদাতাআলার দিকে আহ্‌বানকারী তাঁর লেকা বা সাক্ষাতলাভে কল্যাণমণ্ডিত হওয়া ব্যতিরেকে অন্য কোনও দলিল-প্রমাণ নেই যা দুনিয়াকে খোদার অস্তিত্বে বিশ্বাসী করাতে পারে। আল্লাহ্‌র জ্যোতির মাধ্যমে প্রত্যক্ষ করে তাদের দেখে যেন খোদার নূর দেখা যায়– এই মাকাম বিপুলভাবে ও বহুলরূপে আহ্‌মদীয়া জামাতে হাসিল হওয়া উচিত। এই অর্থে আপনারা এ বছরটিকে লেকা-এ- বারীতাআলার অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সাক্ষাতলাভের বছরে পরিণত করুন, যে সমস্ত শত্রু আমাদের ধ্বংসের স্বপ্ন দেখছে যাতে তারা যেখানে নিজেদের অকৃতকার্যতা ও ব্যর্থতা অবলোকন করে সেখানে আপনাদেরকে খোদার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হতে প্রত্যক্ষ করতে থাকে–তারা যেন দেখতে পায় যে, আহ্‌মদীয়া জামাতের ঘরে-ঘরে খোদার নৈকট্য প্রাপ্ত লোক গড়ে উঠেছে- তাদের মধ্যে যারা আগে অন্তঃসারশূন্য জীবন যাপন করতো তারা সবাই-আবাল-বৃদ্ধ বণিতা মৃত্যুবরণের পূর্বেই 'আব্‌রার'-পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত হতে আরম্ভ করেছে। ইহাই সেই ঈদ, যা প্রকৃত এবং চিরস্থায়ী ঈদ।

(সাপ্তাহিক 'বদর'-কাদিয়ান, ২০শে মার্চ, ১৯৯৭ইং)

অনুবাদ ঃ মাওলানা আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ, সদর মুরব্বী

দোয়ার জলসার কার্য বিবরণী

[ইহা ১৯০২ সনের ২রা ফেব্রুয়ারী হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর ঘোষণা অনুযায়ী কাদিয়ানে অনুষ্ঠিত হয়।]

(নবম কিস্তি)

এখন আমি পুনরায় আসল কথার দিকে প্রত্যাবর্তন করে বলতে চাই যে, প্রথমে এ সূরাতে খোদাতাআলা রব্বিন্নাস বলেছেন। অত:পর মালিকিন্নাস, শেষে ইলাহিন্নাস বলেছেন। ইহা মানুষের আসল উদ্দেশ্য ও আকাংখা। 'ইলাহ্' বলতে বুঝায় উপাস্যকে যার অর্থ হলো উদ্দেশ্য ও আকাংখার পাত্র। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্-এর অর্থ ইহাই যে, লা মা'আবূদ লী ওয়ালা মাকসূদ লী ওয়ালা মাত্বূব লী ইল্লাল্লাহ (আমার আল্লাহ্ ব্যতিরেকে অন্য কোন উপাস্য, কোন উদ্দেশ্য, কোন আকাংখার পাত্র আর নেই)। ইহাই সত্যিকারের তৌহীদ বা একত্ববাদ। এর অর্থ হলো সকল প্রশংসা ও গুণকীর্তনের অধিকারী আল্লাহ্তাআলাকেই নির্ধারিত করা। অতঃপর বলেছেন, মিন শার্‌রিল ওয়াস্ ওয়াসিল খন্নাস অর্থাৎ কুমন্ত্রণা প্রদানকারী অপশক্তি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করো। আরবীতে 'খন্নাস' শব্দটি সাপ অর্থে ব্যবহৃত হয়। ইবরানী ভাষায় ইহাকে 'নাহাশ' বলে। এ জন্যে বলা হয় যে, উহা আগেও অপকর্ম করেছে। এখানে ইবলীস বা শয়তান বলা হয়নি যেন মানুষের প্রাথমিককালের পরীক্ষার কথা মনে আসে যে, কীভাবে শয়তান তাদের পিতা-মাতাকে ধোঁকা দিয়েছিলো। ঐ সময়ে উহার নাম 'খন্নাস'ই রাখা হয়েছিলো। এ পরম্পরা আল্লাহ্তাআলা এজন্যে অবলম্বন করেছেন যেন মানুষকে প্রাথমিককালের ঘটনা স্মরণ করিয়ে দেয় যে, যেভাবে শয়তান খোদাতাআলার আনুগত্য থেকে মানুষকে ধোঁকা দিয়ে অবাধ্য করেছে, তেমনিভাবেই সে কোন সময় দেশের শাসকের আনুগত্য থেকেও অমান্যকারী ও অবাধ্য না করে দেয়। এমনিতেই মানুষ সর্বদা নিজের আত্মার কামনা-বাসনা ও পরিকল্পনাসমূহের ব্যাপারে হিসাব-নিকাশ করতে থাকে যে, আমার মধ্যে দেশের শাসনকর্তার আনুগত্য কতটা আছে এবং চেষ্টা করতে থাকে এবং খোদার নিকট দোয়া করতে থাকে যে, কোন দরজা দিয়ে শয়তান এর মধ্যে প্রবেশ করে না বসে। এখন এ সূরার মধ্যে আনুগত্যের যে আদেশ রয়েছে ইহা খোদাতাআলার আনুগত্যের আদেশ। কেননা, আসল আনুগত্য তো তাঁরই প্রাপ্য। কিন্তু পিতা-মাতা, শিক্ষক ও পথ-প্রদর্শক ও দেশের শাসকের আদেশও খোদাই প্রদান করেছেন। আর আনুগত্যের ফলে 'খন্নাসের' কবল থেকে মুক্তিলাভ হবে। সুতরাং আশ্রয় প্রার্থনা করো যেন খন্নাসের কুমন্ত্রণার ক্ষতি থেকে রক্ষা প্রাপ্ত হও। কেননা, মু'মিন একটি গর্তে দু'বার দংশিত হয় না। একবার যে পথ দিয়ে বিপদ আসে দ্বিতীয়বার উহাতে ক্লিষ্ট হয়ো না। অতএব এ সূরাতে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে যে, দেশের শাসকের আনুগত্য করো। খন্নাসের মধ্যে অপশক্তিকে এমনভাবে সুপ্ত রাখা হয়েছে যেভাবে খোদাতাআলা গাছ-পালা, পানি, আগুন প্রভৃতি ও মৌলিক পদার্থের মধ্যে বৈশিষ্ট্য রেখে দিয়েছেন। ('উনসর) অর্থাৎ 'মৌল উপাদানসমূহ' শব্দটি আসলে ('আন সির্) অর্থাৎ 'সুপ্ত হতে'। আরবীতে 'সোয়াদ' 'সীন'-এ রূপান্তরিত হয়ে যায়। অর্থাৎ এসব বস্তু ঐশী গোপনীয়তার অন্তর্ভুক্ত। প্রকৃতপক্ষে এখানে এসে মানবীয় গবেষণা থেমে যায়। মোটকথা প্রত্যেকটি বস্তুই খোদার পক্ষ থেকে প্রদত্ত। হোক না তা মৌলিক ধরনের বা যৌগিক ধরনের। যখন এ কথা ইহাই যে, এমন শাসকগণকে প্রেরণ করে তিনি হাজারো রকমের অসুবিধা থেকে আমাদেরকে রক্ষা করেছেন এবং এমন পরিবর্তন আনয়ন করেছেন যে, একটি জ্বলন্ত তন্দুর থেকে বের করে এমন একটি বাগানে আশ্রয় দিয়েছেন যেখানে মনোমুগ্ধকর গাছ-পালা রয়েছে। এবং সবদিকে নদ-নদী প্রবাহিত। আর মৃদুমন্দ শীতল বায়ু প্রবাহিত রয়েছে। যদি কেউ এসব অনুগ্রহরাজি অস্বীকার করে তাহলে ইহা কতই না অকৃতজ্ঞতার কাজ হবে ! বিশেষ করে আমাদের জামাতের লোকদের পক্ষে, যাদেরকে খোদাতাআলা অন্তর্দৃষ্টি দিয়েছেন এবং যাদের মধ্যে সত্যিকার অর্থে কপটতা নেই। কেননা, তাদেরকে যার সাথে সম্পর্কযুক্ত করা হয়েছে তার মধ্যে অণু পরিমাণও কপটতা নেই। কৃতজ্ঞপরায়ণের উত্তম দৃষ্টান্তে পরিণত হওয়া উচিত আর আমার পরিপূর্ণ ও দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, আমার জামাতে কপটতা নেই এবং আমার সাথে সম্পর্ক সৃষ্টিকরণে তাদের বিচক্ষণতা কোন ভুল করে নি। এজন্যে যে, আমি প্রকৃতপক্ষে সেই ব্যক্তি যার আবির্ভাবে ঈমানী বিচক্ষণতা লাভের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। আর খোদাতাআলা সাক্ষী ও অবহিত আছেন যে, আমিই সেই **সত্যবাদী , বিশ্বস্ত, ও প্রতিশ্রুত** ব্যক্তি যার **প্রতিশ্রুতি** আমাদের প্রভু ও নেতা সত্যবাদী ও সত্যায়নকারী রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র মুখ প্রদান করে গিয়েছিলো। আর আমি সত্য সত্যই বলছি যে, যে আমার সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করে নি সে এই কল্যাণ থেকে বঞ্চিত।

বিচক্ষণতা আসলে একটি অলৌকিক বিষয়। ' ফেরাসত' শব্দটিতে 'ফা' অক্ষরে 'যবর' দ্বারাও আছে এবং 'ফা' অক্ষরে 'যের' দিয়েও আছে। যখন 'যবর' দ্বারা লেখা হয় তখন উহার অর্থ হয় ঘোড়ার ওপরে চড়া। মু'মিন 'ফারাসতের' সাথে নিজের আত্মার চাবুক নিয়ে সওয়ার হয়। খোদার পক্ষ থেকে তার জ্যোতিঃ লাভ হয় যদ্বারা সে পথ চলে। এ জন্যেই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম বলেছেন – ইত্তাকু ফিরাসাতিল মু'মিনি ফাইন্নাহু ইয়ানযুরু বিনূরিল্লাহ্ অর্থাৎ মু'মিনের বিচক্ষণতাকে ভয় করো। কেননা, সে আল্লাহ্র জ্যোতির মাধ্যমে দেখে থাকে। মোটকথা আমাদের জামাতের সত্যিকারের বিচক্ষণতার বড় দলীল এই যে, তারা খোদার নূর ও জ্যোতিকে সনাক্ত করেছে। এ ভাবেই আমি আশা রাখি যে, আমাদের জামাত বাস্তবতার ক্ষেত্রেও উন্নতি করবে। কেননা, তারা কপট নয়। আর তারা আমাদের বিরুদ্ধবাদীগণের এসব কর্মপদ্ধতি থেকে সর্বৈব পবিত্র যে, যখন তারা সরকারের সাথে সাক্ষাৎ করে তখন তাদের প্রশংসা করে। আর যখন ঘরে আসে তখন কাফের বলে। হে আমার জামাত! শোন, মনে রাখো যে, খোদা এমন কর্মপদ্ধতি পসন্দ করেন না। তোমরা যারা আমার সাথে সম্পর্ক রাখো **পুণ্যবানদের সাথে পুণ্য কর্ম করো এবং পাপীদেরকে ক্ষমা করো।** কোন ব্যক্তি সত্যবাদী হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ রং অবলম্বন না করে। যে কপটতাপূর্ণ চাল-চলন বজায় রাখে এবং ঐ রং অবলম্বন করে পরিশেষে সে ধৃত হয়। এর বহু দৃষ্টান্ত আছে। মিথ্যেবাদীর স্মরণ শক্তি থাকে না।

('রোয়েদাদ জলসা দোয়া' পুস্তক থেকে অনূদিত- সাহেবুল কাহ্ফ)

(চলবে)

হাকীকাতুল ওহী

মূল ঃ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ)

অনুবাদক ঃ নাজির আহমদ ভূঁইয়া

(১৩শ সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর)

ক্রমিক নম্বর	চিঠি প্রেরণের তারিখ	প্রেরকের নাম	সাকিন	জেলা	চিঠির বিষয়-বস্তুর সার-সংক্ষেপ
৪২	২ সদর	সৈয়দ মীর আলী শাহ্ সাহেব সাব-ইন্সপেকটর, পুলিশ	জালালা-বাদ	ফিরোজ পুর	৩১ শে মার্চে আকাশে একটি ভীতিপ্রদ আগুন দেখা গিয়াছে। হাজার হাজার মানুষ ইহা দেখিয়াছে। খোদার ভবিষ্যদ্বাণী যেভাবে বর্ণনা করা হইয়াছিল, তদ্রূপেই পূর্ণ হইয়া গিয়াছে।
৪৩	১ সদর	নেযাম উদ্দিন	জোড়া	লাহোর	মোবারক হউক। হুযূরের ভবিষ্যদ্বাণী অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। ৩১ শে মার্চে একটি ভীতিপ্রদ ও আশ্চর্যকর ঘটনা ঘটা সম্পর্কে সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল। (তদনুযায়ী) অগ্নি স্ফুলিংগ দেখা গিয়াছে। ইহা খুবই ভীতিপ্রদ ছিল।
৪৪	২ সদর	মোহাম্মদ ইসমাঈল	বেদাদ পুর	ঐ	মোবারক হউক। ঐ ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, যাহার সম্পর্কে এই সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল যে, ৩১ শে মার্চে একটি ভীতিপ্রদ ও আশ্চর্য ঘটনা ঘটিবে। বস্তুত: ঐ ঘটনা ইহাই ছিল যে, আকাশে একটি অগ্নিপিণ্ড দেখা গিয়াছে।
৪৫	১লা এপ্রিল, ১৯০৭সাল	মোহাম্মদ আলী শিক্ষক	তলুম্ভী মূসা খান	সিয়াল কোট	৩১ শে মার্চ সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণী ছিল, উহা সুস্পষ্টভাবে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। প্রত্যেকে স্বীকার করিতেছে যে, আসমানী আগুন ৩১ শে মার্চে দেখা গিয়াছে। ইহাতে ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে।
৪৬	৫ সদর	সৈয়্যদ কাসেম শাহ্	মইন উদ্দীন পুর	গুজরাত	বাশরাহ্ সদরের সত্যায়ন
৪৭	৩ সদর	আবদুল্লাহ্ হাকিম	রালু	জলন্ধর	হে উদাসীনরা! আকাশ এখন অগ্নি বর্ষণ করিবে।
৪৮	ঐ	আবদুল আযীয আহমদী	দরগাহী ওয়ালা	গুজরাঁ ওয়ালা	ঐ
৪৯	ঐ	মিয়াঁ মোহাম্মদ দীন	সিয়াল কোট	ঐ	ঐ
৫০	৩ সদর	গোলাম আহমদ	করিয়াম	ঐ	ঐ
৫১	ঐ	মোহাম্মদ হোসাইন ক্লার্ক	আওদারে	গুজরাঁ ওয়ালা	ঐ
৫২	ঐ	এনায়েত উল্লাহ	কুঞ্জা	গুজরাত	ঐ

সংশোধনী ঃ গত সংখ্যায় অনবধানতাবশত: মূল গ্রন্থকারের নাম হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী-এর স্থলে 'হযরত মির্যা গোলাম কাদিয়ানী' ছাপা হয়েছে, এজন্যে আমরা ক্ষমাপ্রার্থী–পাক্ষিক আহমদী

সিভিল এণ্ড মিলিটারী গেজেট পত্রিকা লাহোর

তারিখ ৬ই এপ্রিল, ১৯০৭ সাল এর অনুবাদ

একজন ইংরেজ সংবাদদাতা সিভিল এণ্ড মিলিটারী গেজেটকে লেখেন, জনাব, রবিবার সন্ধ্যা চারটা ও পাঁচটার মধ্যে আমি ডালহৌসি হইতে উত্তর দিকে এইরূপ একটি উল্কাও দেখিয়াছি যেইরূপে আপনাদের ৩রা এপ্রিল তারিখের পত্রিকা হইতে জানা যায় যে, এই দিনে এই সময়েই লাহোরের একটি গোলাকার শুভ্র স্তম্ভ দেখা গিয়াছিল, যাহার ক্ষুদ্র অংশ নীচের দিকে ছিল। উহাকে ডালহৌসি হইতে প্রায় বিশ মাইলের দূরত্বে উঠিতে দেখা গিয়াছে। উহা ডালহৌসির উপরিভাগ হইতে অনেক উচ্চে ছিল। ইহার চমকানীতে পাহাড়ের বরফ হলুদ রং হইয়া গিয়াছিল। এই ঘটনা এইরূপ আশ্চর্যের ছিল যে, আমি দূরবীণ লইয়া উহাকে ভালভাবে দেখিতে লাগিলাম। প্রথমে আমি ধারণা করিলাম জঙ্গলের কোথাও আগুন লাগিয়া গিয়াছে এবং ইহা তাহার ধুঁয়া। কিন্তু তৎক্ষণাৎ আমার মনে হইয়া গেল এই মওসুমে জঙ্গলে আগুন লাগিতে পারে না। এতদ্ব্যতীত জঙ্গলের আগুনের ধুঁয়া কেবল এক জায়গা হইতে উঠে না, বরং অনেক জায়গা হইতে উঠে। এই নৈসর্গিক ঘটনা পাঞ্জাবের তিন জায়গায় ঘটিয়াছে। ইহাতে প্রতীয়মান হয় ঐ অগ্নি গোলা একটি ছিল না, বরং অগ্নি গোলার বিচ্ছুরণ ছিল। প্রত্যেকটি উল্কার সহিত অনেক ছোট ছোট টুকরা ছিল, যাহা কেহ দেখে নাই। (২) আমাদের নিকট চিঠি আসিয়াছে। ঐগুলি হইতে জানা যায় যে, গত রবিবারের অগ্নি গোলা পাটিয়ালা হইতে ঝিলাম পর্যন্ত দেখা গিয়াছিল। একজন সংবাদদাতা লেখেন, জম্মুতে উহার সহিত একটি তোপের আওয়াজ ছিল। কপুরথলা হইতে এক ভদ্রলোক লেখেন, পৃথিবী হইতে আকাশ পর্যন্ত একটি স্তম্ভ দেখা গিয়াছিল। ইহা ঐ কাহিনীর উপর আলোকপাত করিতেছে, যাহা ইয়াকুবের সিঁড়ি সম্পর্কে বর্ণিত আছে। রিয়ায় ৪ ব্যক্তি ভয়ে বেহুশ হইয়া গিয়াছে।

সমুজ্জ্বল নিদর্শন

১৯৮ নম্বর

লাহোরের অবসরপ্রাপ্ত একাউন্‌টেন্ট মিথ্যা মূসা বাবু এলাহী বক্স মরিয়া গিয়াছে। পাঠকগণ, আপনাদের স্মরণে থাকিবে যে, এলাহী বক্স নামক এক ব্যক্তি লাহোরের একাউনটেন্ট ছিল। যখন আমি খোদাতাআলা হইতে ওহী পাইয়া এই ব্যাপারটি প্রকাশ করিলাম যে আমি প্রতিশ্রুত মসীহ্ তখন সে (এলাহী বক্স) আমার নিকট হইতে মুখ ফিরাইয়া নিয়া দাবী করিল যে, আমি মূসা। বিস্তারিত বিষয়টি এই যে, বহু দিন হইতে উল্লেখিত এলাহী বক্স আমার সহিত ভক্তি-শ্রদ্ধার সম্পর্ক রাখিত। সে বার বার কাদিয়ানে আসিত এবং আমাকে খোদাতাআলার পক্ষ হইতে একজন সত্য ইলহামপ্রাপ্ত ব্যক্তি বলিয়া জানিত। সে আমার খেদমত করিত। কোন কোন সময় এমন হইত যে, ভোরে নামাযের পর আমি অমৃতসরে শুইতাম। আমার মুখের উপর চাদর ছিল। তখন এক ব্যক্তি আসিল এবং সে আমার পা টিপিতে শুরু করিয়া দিল। যখন আমি চাদর উঠাইলাম তখন দেখিলাম ঐ ব্যক্তি এলাহী বক্সই ছিল। এই কথা লেখার উদ্দেশ্য এই যে, তাহার নিষ্ঠা এই পর্যায়ে গিয়া পৌঁছিয়াছিল যে, কোন রকমের খেদমত করিতে সে দ্বিধা ও সংকোচ করিত না। সে নেহায়েত বিনয়ের সহিত নিজকে সাধারণ সেবকদের ন্যায় মনে করিত। আর্থিক সেবাতেও সে কোনরূপ চেষ্টার ত্রুটি করিত না। যতদিন পর্যন্ত খোদা চাহিলেন ততদিন সে এইরূপ নিষ্ঠার অবস্থায় রহিল। আমার বড় আশা ছিল যে, সে তাহার নিষ্ঠার অনেক উন্নতি করিবে। যখন আমি কোন উপলক্ষ্যে কাদিয়ান হইতে লুধিয়ানা বা আম্বালা বা অন্য কোন স্থানে যাইতাম তখন সুযোগ ও সময় পাইলে সে ঐ সকল স্থানে পৌঁছিয়া যাইত। অধিকাংশ সময় তাহার বন্ধু মুন্সী আবদুল হক একাউনটেন্টও তাহার সঙ্গে থাকিত। অত:পর কিছুকাল পরে তাহার এই ধারণা সৃষ্টি হইল যে, আমার নিকট ইলহাম হয়। ইহাই একটি বিষাক্ত বীজ ছিল, যাহা নিয়তি তাহার মধ্যে বপন করিয়া দিয়াছিল। ইহার পরে ভিতরে ভিতরে তাহার নিষ্ঠার অবস্থায় কিছুটা পরিবর্তন দেখা দিতে শুরু করিল।

অতঃপর যে সময় খোদাতাআলা আমাকে লোকদের নিকট হইতে বয়াত নেওয়ার জন্য প্রত্যাদিষ্ট করিলেন এবং ৪০ (চল্লিশ) বা ইহার চাইতে কিছু বেশী লোক ঐ বয়াত গ্রহণ করিল এবং খোদাতাআলার আদেশ অনুযায়ী সাধারণভাবে প্রত্যেককে শুনাইলাম যে, যে ব্যক্তি ভক্তি রাখে সে বয়াত নিতে পারে। তখন এই কথা শুনা মাত্রই এলাহী বক্সের হৃদয় বিগড়াইয়া গেল। কিছুদিন পর সে তাহার বন্ধু মুন্সী এলাহী বক্সকে সাথে লইয়া আমার নিকট কাদিয়ানে আসিল। সে তাহার ইলহাম শুনানোর উদ্দেশ্যে আসিল। এ যাত্রায় তাহার মেজায এত কঠোর হইয়া গিয়াছিল যেন সে এলাহী বক্স ছিল না, অন্য মানুষ হইয়া গিয়াছিল। সে ঔদ্ধত্যের সহিত তাহার ইলহাম শুনাইতে শুরু করিল। ছোট একটি নোট বইতে ইলহামগুলি লিপিবদ্ধ ছিল, যাহা তাহার পকেটে ছিল। তন্মধ্যে সে শুনাইল যে, আমি স্বপ্নে দেখিলাম আপনি আমাকে আপনার বয়াত করার জন্য বলিতেছেন। আমি উত্তর দিলাম আমি বয়াত করিব না ; বরং তুমি আমার বয়াত কর। এই স্বপ্নের দরুন সে মাথা হইতে পা পর্যন্ত অহংকার ও দম্ভে পূর্ণ হইয়া গেল। সে মনে করিল আমি এইরূপ একজন বুযুর্গ যে, আমার বয়াতের প্রয়োজন নাই, বরং তাহার উচিত আমার বয়াত করা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা ছিল শয়তানী প্ররোচনা, যাহা তাহার পদস্খলনের কারণ হইল। ব্যাপারটি এই যে, যখন মানুষের হৃদয়ে অহংকার ও অস্বীকার গুপ্ত থাকে তখন ঐ অস্বীকারই স্বগোক্তির ন্যায় স্বপ্নে দেখা দেয় এবং এক নির্বোধ মনে করে ইহা খোদার পক্ষ হইতে। অথচ ঐ অস্বীকার কেবল তাহার গুপ্ত ধ্যান-ধারণা হইতে সৃষ্টি হয়। খোদার সহিত উহার কোন সম্পর্ক থাকে না। অতএব শত শত অজ্ঞ ব্যক্তি কেবল এই স্বগোক্তির দরুন বিনাশ হইয়া যায়। মোট কথা এলাহী বক্স অত্যন্ত দম্ভ ও আত্মম্ভরিতার সহিত ঐ স্বপ্ন আমাকে শুনাইল। তাহার বোকামীতে আমি আফসোস করিতাম। কেননা, আমি নিশ্চিতরূপে জানিতাম, সে যাহা কিছু শুনাইতেছে তাহা কেবল স্বগোক্তি। কিন্তু যেহেতু আমি তাহার হৃদয়ে অহংকার অনুভব করিলাম এবং দম্ভ ও আত্মম্ভরিতার লক্ষণ দেখিলাম এবং তাহার কথার ঝাঁঝ দেখিতে পাইলাম, সেজন্য আমি তাহাকে উপদেশস্বরূপ কিছু বলা নিরর্থক মনে করিলাম। ইহা আফসোসের ব্যাপার যে, অধিকাংশ মানুষ প্রত্যেক কথা যাহা তন্দ্রার অবস্থায় তাহাদের মুখে জারী হয় উহাকে তাহারা খোদার কথা বলিয়া সাব্যস্ত

করে এবং এইভাবে তাহারা নিজেদেরকে "যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নাই উহার পশ্চাদানুসরণ করিও না" (সূরা বনী ইসরাঈল – আয়াত ৩৭)– আয়াতের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দেয়। স্মরণ রাখা উচিত, যদি কোন কথা মুখে জারী হয় এবং উহা আল্লাহ্ ও রসূলের কথার পরিপন্থী না-ও হয়, তবুও উহাকে খোদার কথা বলা যায় না, যতক্ষণ পর্যন্ত খোদাতাআলার কর্ম উহা সম্পর্কে সাক্ষ্য না দেয়। কেননা, মানুষের দুশমন অভিশপ্ত শয়তান যেভাবে ও যে পদ্ধতিতে মানুষকে ধ্বংস করিতে চাহে, ঠিক সেভাবে এই বিভ্রান্তকারীর ইহাও একটি পদ্ধতি যে, সে তাহার কথা মানুষের হৃদয়ে প্রবেশ করাইয়া তাহাকে এই বিশ্বাস দেয় যেন উহা খোদার কথা। পরিণামে এইরূপ ব্যক্তি ধ্বংস হইয়া যায়।

অতএব যাহার উপর কোন কথা অবতীর্ণ হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত ইহাতে তিনটি লক্ষণ দেখা না যায় ততক্ষণ পর্যন্ত উহাকে খোদার কথা বলার অর্থ হইবে নিজকে ধ্বংস করা।

প্রথম – ঐ কথা কুরআন শরীফের বিরোধী ও পরিপন্থী হইতে পারিবে না। কিন্তু এই লক্ষণ তৃতীয় লক্ষণ ছাড়া (যাহা নীচে লেখা হইবে) নাকচ হইয়া যাইবে ; বরং যদি তৃতীয় লক্ষণ না থাকে তবে এই লক্ষণ দ্বারা কিছুই প্রমাণিত হয় না।

দ্বিতীয় – এই কথা এইরূপ ব্যক্তির উপর অবতীর্ণ হইতে হইবে যাহার প্রবৃত্তি উত্তমরূপে পবিত্র হইয়া গিয়াছে এবং সে এই সকল আত্মবিলোপকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, যাহারা সম্পূর্ণরূপে প্রবৃত্তির আবেগ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে এবং তাহাদের প্রবৃত্তিতে এইরূপ এক মৃত্যু নামিয়া আসিয়াছে যদ্দরুন তাহারা খোদার নিকটবর্তী ও শয়তান হইতে দূর হইয়া পড়িয়াছে। কেননা, যে ব্যক্তি যাহার নিকটবর্তী সে তাহারই ডাক শুনে। অতএব যে শয়তানের নিকটবর্তী সে শয়তানের ডাক শুনে। যে খোদার নিকটবর্তী সে খোদার ডাক শুনে। মানুষের চূড়ান্ত প্রচেষ্টা হওয়া উচিত প্রবৃত্তির পবিত্রকরণ। ইহাতে সকল সাধনার পথ শেষ হইয়া হইয়া যায়। অন্য কথায় ইহা এক মৃত্যু, যাহা সকল অভ্যন্তরীণ ময়লাকে জ্বালাইয়া দেয়। যখন মানুষ তাহার সাধনার পথ শেষ করে তখন আল্লাহ্‌র হস্তক্ষেপ নামিয়া আসে। তখন খোদা তাহার এই বান্দাকে, যে প্রবৃত্তির বাসনা কামনা নাশ করিয়া বিলুপ্তির পর্যায়ে পৌঁছিয়া যায়, তাহাকে তত্ত্বজ্ঞান ও ভালবাসার জীবন দ্বারা পুনরায় জীবিত করেন এবং স্বীয় অসাধারণ নিদর্শনাবলী দ্বারা তাহাকে আশ্চর্যকর আধ্যাত্মিক জগতে বিচরণ করান এবং তাঁহার (খোদার) ভালবাসার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আকর্ষণ তাহার হৃদয়ে ভরিয়া দেন, যাহা জগদ্বাসী বুঝিতে পারে না। এই অবস্থায় বলা হয় যে, সে নূতন জীবন লাভ করিয়াছে, যাহার পরে মৃত্যু নাই।

অতএব এই নূতন জীবন পরিপূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান ও পরিপূর্ণ ভালবাসা দ্বারা পাওয়া যায় এবং পরিপূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান খোদার অসাধারণ নিদর্শনাবলী দ্বারা অর্জিত হয়। যখন মানুষ এই পর্যায়ে পৌঁছিয়া যায় তখন খোদার খাঁটি কথোপকথন ও সম্বোধনের সৌভাগ্য তাহার হয়। কিন্তু এই লক্ষণও তৃতীয় পর্যায়ের লক্ষণ ছাড়া বিশ্বাসযোগ্য নহে। কেননা, পরিপূর্ণ পবিত্রকরণ একটি গোপন ব্যাপার। এইজন্য যে, কোন বাজে লোক এইরূপ দাবী করিতে পারে।

সত্য ইলহামপ্রাপ্ত ব্যক্তির তৃতীয় লক্ষণ এই যে, যে কথাকে সে খোদার পক্ষ হইতে আরোপ করে খোদার অবিরাম কর্ম উহা সম্পর্কে সাক্ষ্য দিবে। অর্থাৎ তাহার সমর্থনে এত নিদর্শন প্রকাশিত হইবে যে, বিবেক এই ব্যাপারটি অসম্ভব মনে করিবে যে, এত নিদর্শন সত্ত্বেও উহা খোদার কথা নহে। এই লক্ষণ প্রকৃতপক্ষে সকল লক্ষণের সেরা। কেননা, ইহা সম্ভব যে, একটি কথা যাহা কাহারো মুখে জারী হয় বা কেহ দাবীর সহিত ইলহাম পেশ করে, তাহা অর্থের দিক হইতে কুরআন শরীফের বর্ণনার পরিপন্থী না হয়, বরং বর্ণনা অনুযায়ী হয়, তথাপি তাহা কোন মিথ্যা রচনাকারীর রচনা হইতে পারে। কেননা, একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি, যে মুসলমান কিন্তু মিথ্যা রচনাকারী, সে নিশ্চয় এই বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখিবে যাহাতে সে কুরআন বিরোধী কোন কথা দাবীর সহিত পেশ না করে। নতুবা সে অযথা লোকদের আপত্তির লক্ষ্যবস্তু হইয়া যাইবে। এতদ্ব্যতীত ইহাও সম্ভব যে, ঐ কথা স্বগোক্তি, অর্থাৎ প্রবৃত্তি হইতে একটি কথা মুখে জারী হয় যেভাবে অধিকাংশ শিশু যাহারা দিনে পুস্তকাদি পড়ে রাত্রে কোন কোন সময় ঐ সকল কথাই তাদের মুখে জারী হইয়া যায়। মোট কথা, কোন কথা যাহা দাবীর সহিত ইলহাম বলিয়া পেশ করা হইয়াছে তাহা কুরআন মোতাবেক হওয়া এই কথার নিশ্চিত প্রমাণ নহে যে, উহা নিশ্চিত খোদার কথা। ইহা কি সম্ভব নহে যে, একটি কথা অর্থের দিক হইতে খোদার কথার পরিপন্থী না হইয়াও তাহা কোন মিথ্যা রচনাকারীর রচনাও হইতে পারে। কেননা, এক মিথ্যা রচনাকারী খুব সহজে এই কাজ করিতে পারে যে, সে কুরআন শরীফের শিক্ষা অনুযায়ী একটি কথা পেশ করে এবং বলে, ইহা খোদার কথা যাহা আমার উপর অবতীর্ণ হইয়াছে, বা এইরূপ কথা স্বগোক্তি বলিয়া সাব্যস্ত হইতে পারে বা শয়তানী কথা হইতে পারে।

এইভাবেই এই দ্বিতীয় শর্তটিও (অর্থাৎ যে ইলহামের দাবী করে তাহার প্রবৃত্তি পবিত্র হইয়াছে) নির্ভরযোগ্য নহে। বরং ইহা একটি গোপন ব্যাপার। অনেক অপবিত্র স্বভাববিশিষ্ট ব্যক্তি এই কথা দাবী করিতে পারে যে, আমাদের প্রবৃত্তি পবিত্র হইয়া গিয়াছে এবং খোদার সহিত আমাদের খাঁটি ভালবাসা আছে। অতএব এই বিষয়টিও কোন সহজ বিষয় নহে যে, এই ব্যাপারে দ্রুত সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদীর মধ্যে মীমাংসা করা যাইবে। এই কারণেই কোন কোন নোংরাস্বভাববিশিষ্ট লোক ঐ সকল সম্মানিত ব্যক্তিগণের উপর অপবাদ আরোপ করিয়াছে যাহাদের আত্মা পবিত্র ছিল। উদাহরণস্বরূপ, আজকালকার পাদ্রীরা আমাদের সৈয়্যদ ও মাওলা আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের উপর অপবাদ লাগায়। তাহারা বলে, নাউযুবিল্লাহ্, তিনি (সাঃ) প্রবৃত্তির বাসনা কামনার আনুগত্য করিতেন। তাহাদের হাজার হাজার সাময়িকীতে, পত্র-পত্রিকায় ও পুস্তকাদিতে এইরূপ অপবাদ দেখিতে পাইবে। এইভাবেই ইহুদীরা হযরত ঈসা আলায়হেস সালামের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের অপবাদ লাগাইয়া

থাকে। বস্তুতঃ অল্প কিছুদিন পূর্বে আমি একজন ইহুদীর পুস্তক দেখিয়াছি। ইহাতে না কেবল এই অপবিত্র আপত্তি ছিল যে, নাউযুবিল্লাহ্, হযরত ঈসার জন্ম অবৈধভাবে হইয়াছে, বরং তাঁহার চালচলন সম্পর্কেও নেহায়েত নোংরা আপত্তি উত্থাপন করা হইয়াছে এবং তাঁহার সেবায় যে কয়েকজন মহিলা নিয়োজিত থাকিত তাহাদের সম্পর্কেও খুব বিশ্রী ভঙ্গিতে বর্ণনা করা হইয়াছে। অতএব সেক্ষেত্রে নোংরা স্বভাববিশিষ্ট শত্রুরা এইরূপ পাক-পবিত্র স্বভাবের লোকদিগকে প্রবৃত্তির দাস সাব্যস্ত করিয়াছে এবং তাঁহাদের প্রবৃত্তিকে পবিত্র মনে করে নাই, সেক্ষেত্রে প্রত্যেকে বুঝিতে পারে যে, প্রবৃত্তির পবিত্রতার মাহাত্ম্য শত্রুদের পক্ষে অনুধাবন করা কতখানি মুশকিল। বস্তুতঃ আর্যরা খোদাতাআলার সকল নবীকে কেবল প্রতারক ও প্রবৃত্তির দাস বলিয়া থাকে এবং তাঁহাদের যুগকে ধোঁকা ও প্রতারণার যুগ মনে করে।

কিন্তু তৃতীয় লক্ষণটি এই যে, ইলহাম ও ওহী যাহা একটি কথা, তাহার সহিত খোদার একটি কর্মও থাকিতে হইবে। ইহা এইরূপ একটি পরিপূর্ণ লক্ষণ যাহা কেহ রহিত করিতে পারে না। এই লক্ষণের দরুনই খোদার সত্য নবী মিথ্যাবাদীদের উপর জয়যুক্ত হইয়া আসিতেছেন। কেননা, যে ব্যক্তি দাবী করে যে, আমার নিকট খোদার কথা অবতীর্ণ হয় এবং ইহার সাথে শত শত নিদর্শন প্রকাশিত হয় এবং সে হাজার হাজার ধরনের খোদায়ী সাহায্য ও সমর্থন লাভ করে, কিন্তু তাহার শত্রুদের বিরুদ্ধে খোদার প্রকাশ্য হামলা হয়, এমতাবস্থায় কাহার সাধ্য আছে এইরূপ ব্যক্তিকে মিথ্যাবাদী বলে কিন্তু আফসোস, পৃথিবীতে এইরূপ বহু লোকও আছে যাহারা এই বিপদে কাঁপিয়া যায় যে, কোন স্বগোক্তি বা শয়তানী প্ররোচনায় তাহারা জড়াইয়া পড়ে। তখন তাহারা ইহাকে খোদাতাআলার কথা মনে করিয়া থাকে এবং কর্মরূপ সাক্ষ্যের প্রতি কোন ভ্রূক্ষেপই করে না।

হাঁ, ইহাও সম্ভব যে, কেহ কেহ কখনো কদাচিৎ সত্য-স্বপ্ন দেখিয়া থাকে বা সত্য ইলহাম লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু কেবল ইহার দরুন তাহাদিগকে আল্লাহ্‌র প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ বলা যায় না এবং না এই কথা বলা যায় যে, তাহারা প্রবৃত্তির অন্ধকার হইতে পবিত্র। বরং এতখানি স্বপ্ন ও ইলহামে প্রায় গোটা জগদ্বাসী অংশীদার। ইহা কোন ব্যাপারই নহে। কখনো কখনো স্বপ্ন বা ইলহাম লাভ করার এই উপাদান মানুষের প্রকৃতিতে এইজন্য রাখা হইয়াছে যাহাতে একজন বুদ্ধিমান মানুষ খোদার সম্মানিত রসূলগণ সম্পর্কে কুধারণা পোষণ না করিতে পারে এবং বুঝিতে পারে যে, প্রত্যেক মানুষের প্রকৃতিতে ওহী ও ইলহামের বীজ নিহিত আছে। এমতাবস্থায় ইহার পরিপূর্ণ উন্নতিতে অস্বীকার করা বোকামী।

কিন্তু ঐ সকল লোক যাঁহারা খোদার নিকট ইলহামপ্রাপ্ত ও সম্বোধিত বলিয়া কথিত ও কথোপকথন ও সম্বোধনের মর্যাদা রাখেন এবং মানবজাতিকে আহ্বানের জন্য প্রত্যাদিষ্ট হইয়া থাকেন, তাঁহাদের সমর্থনে খোদাতাআলার নিদর্শন বৃষ্টির ন্যায় বর্ষিত হয়। জগদ্বাসী তাঁহাদের মোকাবেলা করিতে পারে না এবং আল্লাহ্‌র কর্ম ব্যাপকভাবে সাক্ষ্য দেয় যে, তাঁহারা যে সকল কথা পেশ করেন ঐগুলি খোদার কথা। যদি ইলহামের দাবীদার বা এই লক্ষণের প্রতি দৃষ্টি রাখিত তবে তাহারা এই ফেতনা হইতে বাঁচিয়া যাইত।

তদ্রূপেই যদি এলাহী বক্স এই ব্যাপারে কিছুটা চিন্তা করিত যে, তাহার সমর্থনে খোদাতাআলার নিদর্শন কতখানি প্রকাশিত হইয়াছে এবং সে কতখানি সমর্থন ও সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছে ও সাধারণ লোকদের তুলনায় তাহাকে কতখানি স্বাতন্ত্র্য দান করা হইয়াছে, তবে সে এই বিপদে পতিত হইত না। এখন আফসোসের সঙ্গে বলিতে হয়, তাহার মৃত্যুর পর মিথ্যা ও মিথ্যা রচনার একটি পাহাড় রাখিয়া গেল। আমার সম্পর্কে সে এই ইলহাম পেশ করিত যে, আমার জীবদ্দশাতে এই ব্যক্তি প্লেগে ধ্বংস হইবে এবং তাহার সম্পূর্ণ জামাত বিক্ষিপ্ত হইয়া যাইবে। অতএব সে দেখিয়া লইল যে, সে নিজেই প্লেগে ধ্বংস হইল। তাহার দাবী ছিল, সে মরিবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে আমার মূলোৎপাটন না করিবে। কিন্তু সে নিজের চোখে দেখিয়া লইল যে, তাহার মিথ্যা ইলহামের পর আমার জামাত কয়েক লক্ষে পৌঁছিয়া গেল। যখন সে এইরূপ ইলহাম প্রকাশ করিতে শুরু করিল তখন আমার জামাতের ৪০ (চল্লিশ) জনের বেশী লোক ছিল না এবং পরে চার লক্ষ পর্যন্ত পৌঁছিয়া গেল। সে মরিল না যতক্ষণ পর্যন্ত সে সব দিক হইতে তাহার ব্যর্থতা দেখিয়া না লইল এবং আমার কৃতকার্যতা না দেখিয়া লইল। সে তাহার মিথ্যা ইলহামের মাধ্যমে আমার বিরুদ্ধে সে সকল মোকদ্দমা দায়ের করা হইত প্রত্যেক মোকদ্দমায় মনে করিত যে, আমি শাস্তি পাইয়া মহা আযাবে নিপতিত হইয়া যাইব। তাহার নিকট এইরূপ ইলহামই হইত, যেগুলি সে তাহার বন্ধুদের নিকট প্রকাশ করিত। কিন্তু খোদাতাআলা আমাকে প্রত্যেক মোকদ্দমায় সসম্মানে মুক্তি দিতে থাকেন। অথচ ভয়ঙ্কর ব্যর্থতার সহিত তাহার মৃত্যু আসিল। অতএব ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, যখন তাহার প্লেগ হইয়া গেল এবং মৃত্যুকে সে সম্মুখে দেখিতে পাইল তখন সে তাহার সমস্ত ইলহামকে শয়তানী কথা বুঝিয়া থাকিবে। ঐ সময় তাহার নিজের সম্পর্কে স্মরণ হইয়া থাকিবে যে, আমি ভ্রান্তিতে ছিলাম। এই ব্যাপারটি সম্পূর্ণরূপে অযৌক্তিক ও বিবেক বিরোধী যে, সে এতখানি ঠোকর খাইয়া এবং যে প্লেগ আমার প্রতি আরোপ করিত উহা দ্বারা সে নিজেকে আক্রান্ত দেখিয়া ও তাহার শেষ মুহূর্তে আমার কৃতকার্যতা দেখিয়াও সে তাহার পূর্বের অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত থাকিল। তাহার স্মরণ হইতে থাকিবে যে, আমি মূসা হওয়ার দাবী করিয়াছিলাম এবং আমার পুস্তকের নাম "আসায়ে মূসা" (মূসার লাঠি) রাখিয়াছিলাম এবং এই আশা করিয়াছিলাম যে, এই লাঠি ঐ ব্যক্তিকে ধ্বংস করিবে, যে প্রতিশ্রুত মসীহ হওয়ার দাবী করে। তাহার স্মরণ হইতে থাকিবে যে, আমি এই ব্যক্তি যে প্রতিশ্রুত মসীহ হওয়ার দাবী করে, তাহার সম্পর্কে আমার পুস্তক "আসায়ে মূসা"তে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলাম যে, সে আমার জীবদ্দশাতে প্লেগে মরিবে। তাহার স্মরণ হইতে থাকিবে যে, আমি এই পুস্তকেই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলাম যে, আমি মরিব না যতক্ষণ পর্যন্ত আমার এই দুশমনকে বিনাশ না করিয়া দেই। এমতাবস্থায় প্রত্যেক মানুষ

ভাবিতে পারে এই অবস্থায় যেক্ষেত্রে প্লেগ তাহাকে অকস্মাৎ ধৃত করিল সেক্ষেত্রে তাহার কতখানি বেদনা ও আক্ষেপ হইয়া থাকিবে। কে বিশ্বাস করিতে পারে যে, এতখানি ব্যর্থতা এবং তাহার সকল ইলহাম মিথ্যা প্রতিপন্ন হইয়াছে প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও প্লেগের সময় তাহার নিজের মূসা হওয়া সম্পর্কে বিশ্বাস ছিল ? না, না, কক্ষণো না। বরং প্লেগ তাহার সকল ধ্যান-ধারণা টুকরা টুকরা করিয়া দিয়া থাকিবে এবং সতর্ক করিয়া দিয়া থাকিবে যে, সে ভ্রান্তিতে ছিল। বস্তুতঃ এই ঘটনার অনেক পূর্বেই খোদা আমাকে জানাইয়া ছিলেন যে, সে এই সকল ভ্রান্ত ধারণার উপর কায়েম থাকিবে না এবং অবশেষে এই সকল ধারণা পরিত্যাগ করিবে। অতএব ইহাতে সন্দেহ নাই যে, যখন প্লেগ ও অসময়ের মৃত্যুর দৃশ্য তাহার সম্মুখে উদ্ভাসিত হইল যাহা সে উত্তমরূপে জানিত যে, ইহা অসময় ও আমার দাবীর পরিপন্থী তখন নিঃসন্দেহে এই দৃশ্য তাহার বিশ্বাস জমাইয়া থাকিবে যে, তাহার সকল ইলহাম শয়তানী ছিল। এমতাবস্থায় সে প্রতিকারহীন আক্ষেপের সহিত বুঝিয়া থাকিবে যে, আমি ভ্রান্তিতে ছিলাম এবং যাহা কিছু আমি বুঝিয়াছি ঐগুলি খোদাতাআলার পক্ষ হইতে ছিল না। আরো সামনে গিয়া আমি বর্ণনা করিব যে, এইরূপ বুঝা তাহার জন্য জরুরী ছিল। কেননা, মৃত্যুর এই দৃশ্য দ্বারা তাহার ইলহামী কথাগুলি একবার এইরূপ বাতিল সাব্যস্ত হইল যেরূপে আকস্মিকভাবে একটি প্রাচীর পড়িয়া যায়। ইহা তাহার জন্য দূরবর্তী ধারণা ছিল যে, আমি এই প্লেগ হইতে বাঁচিয়া যাইব। কেননা, ১৯০৭ সালের ৭ই এপ্রিল যে তারিখে সে মরিল এবং ইহার পূর্বে লাহোরে এইরূপ তীব্র ও ধ্বংসাত্মক প্লেগ ছিল যে, কোন কোন দিন দুই দুইশতের বেশী লোক মরিত। তাহার এক বন্ধু তাহার একদিন পূর্বে প্লেগে মরিয়া গিয়াছিল, যাহার জানাযায় যাইয়া সে প্লেগ খরিদ করিল। অতএব এই ধ্বংসাত্মক ব্যাধিতে কে বলিতে পারে যে, আমি বাঁচিয়া যাইব? বরং হাজার হাজার লোক প্লেগে আক্রান্ত হওয়া মাত্রই উত্তরসূরীদের জন্য ওসীয়্যত লেখাইয়া থাকে। মোট কথা, প্লেগে আক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথেই তাহার সকল মূসায়ী ক্ষমতা ডুবিয়া গেল। সে হাজার হাজার মরিয়া যাওয়া মানুষকে স্মরণ করিয়া এবং বিশেষভাবে ইয়াকুবের মৃত্যুকে মনে করিয়া বুঝিয়া গেল যে, আমি নিশ্চয় মরিব। এমতাবস্থায় কীভাবে সে এই কথার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারিত যে, আমি মূসা। অতএব ইহা খোদার কৃপা যে, সে তাহার বাজে বিশ্বাসকে সঙ্গে নিয়া গেল না এবং খোদা তাহার ঘাড় ধরিয়া তাহাকে ফিরাইয়া আনিলেন। সে ঐ সমস্ত লোকের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গেল যাহাদের সম্পর্কে খোদাতাআলা বলেন,

"আহলে কিতাব হইতে প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজ মৃত্যুর পূর্বে ইহার (ঈসার ক্রুশীয় মৃত্যুর) উপর অবশ্যই বিশ্বাস রাখিবে" (সূরা আন্ নিসা, আয়াত ১৬০)। (ক্রমশঃ)

অনুবাদ : নাজির আহমদ ভূঁইয়া

সন্তান লাভ

❑ আল্লাহ্তাআলা তাঁর অশেষ ফযল ও রহমতে গত ১৫ই জানুয়ারী ৯৮ইং, ২রা মাঘ ১৪০৪ বাংলা, ১৫ই রমযান ১৪১৮ হি: রোজ বৃহস্পতিবার রাত্রি ১২ : ০৩ মিনিটের সময় আমাদেরকে এক কন্যা সন্তান দান করেছেন, আলহামদুলিল্লাহ্। বর্তমানে প্রসূতি ও নবজাতিকা ভাল ও সুস্থ আছে। নবজাতিকা একজন ওয়াকফে নও। প্রকাশ থাকে যে, নবজাতিকার পিতা বিবাহের পূর্বে ইচ্ছা করেছিল যে বিবাহের পর প্রথম সন্তান ওয়াকফ করবে। প্রসূতির সুস্থতা এবং নবজাতিকার দীর্ঘায়ু ও যাতে খাদেমায়ে দীন হয় সে জন্য সকল আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নীর নিকট খাস দোয়ায় আবেদন করছি।

মোঃ খলিলুর রহমান ভূইয়া ও
শাহনাজ আকতার
ঢাকা

❑ আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আমার প্রথমা কন্যা মেনোকা ইসলাম ও জামাতা জাহেদ রফিকুল ইলাম (হিরন), খুলনাকে গত ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৯৭ইং রোজ মঙ্গলবার এক কন্যা সন্তান দান করেছেন, আলহামদুলিল্লাহ।
আমি আমার কন্যা ও নাতনীর জন্য জামাতের সকল ভাই বোনের নিকট দোয়া প্রার্থনা করছি।

নূরজাহান বেগম
স্বামী : মরহুম গোলাম মহিউদ্দিন
কুষ্টিয়া

ওয়াকফে জাদীদ (নওমোবাইন) প্রসঙ্গে

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আই:) খাকসারকে সেক্রেটারী ওয়াকফে জাদীদ (নওমোবাইন), আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ হিসেবে অনুমোদন দিয়েছেন, আলহামদুলিল্লাহ্। আমি সকলের দোয়া ও পূর্ণ সহযোগিতা কামনা করছি। এ পর্যায়ে স্থানীয় জামাতের আমীর/প্রেসিডেন্ট ও সংশ্লিষ্ট সেক্রেটারী সাহেবানকে সত্বর বিগত কয়েক বছরের নওমোবাইন (নবদীক্ষিত) ভ্রাতাগণের তালিকা প্রণয়ন করে তাদের কাছ থেকে বর্তমান (১৯৯৮) বছরের চাঁদার ওয়াদা নিয়ে খাকসারের নিকট পাঠাতে অনুরোধ করছি। ওয়াদার নিম্নতম পরিমাণ হলো ৭০/০০ টাকা। তবে হুযূর (আইঃ) এর কমও যদি কেউ ওয়াদা করে তাদেরকেও এর মধ্যে শামেল করতে বলেছেন। সকলকে ঈদ মোবারক।

শফিক আহমদ
সেক্রেটারী ওয়াকফে জাদীদ, (নওমোবাইন)
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ

"ত্রৈমাসিক আনসারুল্লাহ্-এর গ্রাহক হউন"

মজলিস আনসারুল্লাহ্ বাংলাদেশের একমাত্র বুলেটিন ত্রৈমাসিক আনসারুল্লাহ্ এখন থেকে প্রতি তিন মাস অন্তর নিয়মিত প্রকাশ করার প্রচেষ্টা হাতে নেয়া হয়েছে। আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশের আসন্ন ৭৫ তম সালানা জলসায় এর চলতি সংখ্যা বন্ধুদের হাতে তুলে দেওয়ার প্রয়াস চলছে ইনশাআল্লাহ্। আনসারুল্লাহ্ নিয়মিত নিজে পড়ুন ও এর গ্রাহক হউন এবং স্থানীয় সকল মজলিসে প্রত্যেক আনসারুল্লাহ্ সদস্যকে ইহার গ্রাহক হতে ও পাঠ করতে আমাদেরকে সহায়তা করতে সংশ্লিষ্ট সকলের খেদমতে বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। বাৎসরিক গ্রাহক-চাঁদা সডাক মাত্র ৪০.০০ (চল্লিশ) টাকা ধার্য্য করা হয়েছে। পূর্ণ ঠিকানা সহ নির্ধারিত গ্রাহক-চাঁদা নিম্ন ঠিকানায় প্রেরণের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। আপনাদের মূল্যবান পরামর্শ, লেখা ও গ্রাহক-চাঁদা সত্বর প্রেরণ করুন।

শফিক আহমদ
প্রচার সম্পাদক, 'আনসারুল্লাহ্'
বাংলাদেশ মজলিস আনসারুল্লাহ্
৪, বকশি বাজার রোড, ঢাকা-১২০১

ঈদের খুৎবা

এ বিশ্বজনীন ঈদ যা আহমদী জামাতের পক্ষ থেকে পালিত হচ্ছে তা আল্লাহ্‌তাআলার অনুগ্রহে স্বীয় পরিমণ্ডল ও ব্যাপকতায় বিস্তৃত হয়ে চলছে।

সৈয়্যদনা হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) প্রদত্ত ঈদুল ফিতরের খুৎবা, ২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৬ ইং, মসজিদে ফযল, লণ্ডন।

আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের ঈদগুলোর আত্মিক রক্ষা-কারী বিবরণ।

তাশাহ্‌হুদ তাআওউয ও সূরা ফাতিহা পাঠ করার পরে হুযূর (আইঃ) বলেন –

আজ পবিত্র ঈদের দিন। ইহা খুশীর দিন। কিন্তু এ খুশী ও আনন্দ ইসলামী রঙ্গে পালন করা হয়। ইসলামী রঙ্গেই ইহা পালিত হবে। এখন সারা বিশ্বের যেসব আহমদী বন্ধু টেলিভিশনের যোগাযোগের মাধ্যমে আমাদের সঙ্গে ঈদ পালন করছেন তারা ও যারা আজ নয় তো কাল পালন করবেন যখন অন্যান্য এলাকায়ও ভিডিও পৌঁছবে যেখানে এখনও সরাসরি যোগাযোগ হয়নি, সকলকেই আমি আমার পক্ষ থেকে এবং যারা এখানে উপস্থিত রয়েছেন তাদের সকলের পক্ষ থেকে 'আস্‌সালামু আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু' ও 'ঈদ মোবারক'-এর তোহ্‌ফা পেশ করছি।

এ বিশ্বজনীন ঈদ যা আহমদী জামাতের পক্ষ থেকে পালিত হচ্ছে তা আল্লাহ্‌তাআলার অনুগ্রহে স্বীয় পরিমণ্ডলে ও ব্যাপকতায় বিস্তৃতি লাভ করছে এবং এমন এক দিন আসবে সেদিন বেশী দূরে নয়, খোদা করুন যেন তা আমাদের জীবনেই এসে যায়, যখন আমাদের এক ঈদে কোটি কোটি আহমদী বা এথেকেও অধিক যোগদান করবে এবং সারা বিশ্বে একই সাথে পালিত হবে। এতে একটি শ্রুত ও দৃশ্যমান সম্পর্কের মাধ্যমে এক কোটি আহমদী যোগ দেবে। ইহা ইসলামের বিজয়ে একটি নব অর্গলের দ্বার উন্মোচন করবে। আর আল্লাহ্‌তাআলার অনুগ্রহে এভাবে সারা বিশ্বকে ইহা একটি আন্তর্জাতিক জাতিতে রূপান্তরিত করে দেবে– আনন্দেও একীভূত হবে এবং নিজেদের পরিশ্রমে ও সংগ্রামের চেষ্টা-প্রচেষ্টায়ও একীভূত হবে।

আজকের খুৎবার জন্যে আমি হযরত আকদস মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলেহি ওয়া সাল্লামের জীবনের কতিপয় দৃশ্য একত্রিত করেছি। এগুলো এখন আপনাদের সামনে উপস্থাপন করবো। এগুলো ঈদ পালনের সাথে সম্পর্কযুক্ত। আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলেহি ওয়া সাল্লাম কীভাবে ঈদ পালন করতেন তার কতিপয় ঝলক ও দ্যুতি রয়েছে। আপনাদের দৃষ্টিগোচরে থাকলে আপনাদের ঈদগুলোকেও এগুলো সুষমামণ্ডিত করে দেবে, আর আপনাদের ঈদগুলোকেও করে দেবে জ্যোতির্ময়।

সহী মুসলিম গ্রন্থের কিতাবুস্ সালাতের 'ঈদায়েন' অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে, হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলেহি ওয়া সাল্লামের সাথে ঈদের নামাযের দিন উপস্থিত হলাম। তিনি খুৎবার পূর্বে নামায পড়ালেন (যেভাবে আমরা সর্বদা ঐ রীতি অনুযায়ী খুৎবার পূর্বে নামায পড়িয়ে থাকি)। এর পূর্বে কোন আযানও দেয়া হলো না বা কোন একামতও না। পরে নামায শেষ করে তিনি হযরত বিলাল (রাঃ)-এর ওপরে ভর করে দাঁড়ালেন। এথেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইহা তাঁর জীবনের শেষ দিকের কোন এক ঈদের দিন। কেননা, আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলেহি ওয়া সাল্লাম যখন উহুদের যুদ্ধের পর আঘাত পাওয়ার কারণে অথবা ইহুদী মহিলার বিষ প্রয়োগের কারণে দুর্বল হয়ে গিয়েছিলেন তখন থেকে তিনি দাঁড়াতে সাহায্য নেয়া আরম্ভ করেছিলেন, নচেৎ কোন সাহায্য নেয়ার তাঁর প্রয়োজন ছিলো না। সুতরাং বিলালের (রাঃ) সাহায্যে তিনি দণ্ডায়মান হলেন এবং লোকদের তাকওয়া বা খোদাভীরুতা অবলম্বনের জন্যে বিশেষভাবে উপদেশ দিতেছিলেন এবং তাঁর (সাঃ) প্রতি আনুগত্যের প্রতি প্রবণতা সৃষ্টির উপদেশ দিচ্ছিলেন।

তাকওয়ার শিক্ষা দিয়ে বল্লেন যে, **ইহাই সবচে' উত্তম ঈদ। ঈদকে যেসব কথা সার্থক ও সুষমামণ্ডিত করে তার প্রাণ হোল তাক্‌ওয়া। সুতরাং যদি তাক্‌ওয়ার সাথে ঈদ পালিত হয় তাহলে কাপড় নূতন হোক কি পুরাতন উহাতেই ঈদ সজ্জিত হবে।** কেননা, "লিবাসুত্তাক্‌ওয়া যালিকা খায়ের" (খোদা-ভীরুতার পোষাকই উত্তম)। অতএব ঈদের দিন তাকওয়ার কথা বলা দ্বারা বুঝানো হয় যে, তোমরা ভাল ভাল কাপড় নিঃসন্দেহে পরিধান করো কিন্তু **এসব কাপড়ে সৌন্দর্য ও বাহার তখনই সৃষ্টি হবে যদি অভ্যন্তর থেকে তাকওয়া প্রস্ফুটিত হয়। তাহলে উহার রশ্মিসমূহ ঐসব কাপড়কে আলোকিত করতে থাকবে।** সুতরাং তিনি (সাঃ) তাকওয়ার জন্যে তাকিদ করেছেন ও নিজের প্রতি আনুগত্যের প্রবণতা সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন। **তিনি (সাঃ) বলেছেন– আমার আনুগত্যের মধ্যেই গোটা জীবন নিহিত। তাকওয়াতো নির্ভেজাল হতেই পারে না যদি না হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলেহি ওয়া সাল্লামের প্রতি আনুগত্য থাকে।** তাই তাকওয়াতো একটি অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। তাকওয়ার প্রভাব বাইরে কীভাবে পরিদৃষ্ট হবে? উহা আনুগত্যের রঙ্গে দেখা যায়।

অতএব তাকওয়া স্বয়ং যদিও একটি পোষাক নয় অথচ উহার পোষাক হলো আনুগত্য। ইহা আনুগত্যের রঙ্গে বিকশিত হয় এবং পরিদৃষ্ট হয়। ইহা এজন্যে উপলব্ধি করা আবশ্যক নচেৎ তো কেবল বলে দেয়া হয় যে, তাকওয়া আছে। অভ্যন্তরে আছে কিন্তু উহা পোষাকে রূপান্তরিত কীভাবে হবে যদি দেখাই না যায়? পোষাক তো

উহাই যা দেহকে আচ্ছাদিত করে এবং বাহ্যিক চক্ষু দ্বারাও দেখা যায়। অতএব অভ্যন্তরীণ তাকওয়া যা শরীরের আবরণের ভিতরে থাকে উহা তো লোকদের দৃষ্টিতে আসে না। অবশ্য পোষাক পরিদৃষ্ট হয়। ঐ পোষাক কী রকম? **আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলেহি ওয়া সাল্লাম বলেন যে, ইহা হলো আমার আনুগত্য করা। তাই আমার আনুগত্য করলে দুনিয়ার লোকেরা তোমাদের তাকওয়া দেখতে পাবে।** আবার সংক্ষিপ্ত উপদেশ দিলেন যার বিস্তারিত বিবরণ এখানে বর্ণিত হয়নি, কিন্তু এখানে এই মৌলিক কেন্দ্রীয় কথা-বার্তা বলা হয়েছে যেগুলো এ বর্ণনা সংরক্ষণ করে রেখেছে।

অতঃপর তিনি মহিলাদের দিকে তশরীফ নিয়ে গেলেন এবং তাদের নিকটও উপদেশমূলক বক্তব্য রাখলেন। মহিলাদের যেসব উপদেশ দিলেন উহার মধ্য থেকে তুলনামূলকভাবে কতকগুলো বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে, "সদকা-যাকাত আদায় করো, নচেৎ তোমাদের মধ্যে অধিকাংশই দোযখের জ্বালানীতে পরিণত হবে।" এখানে 'অধিকাংশ' শব্দটি খুবই ভীতির কারণ, তাই যখন মহিলাগণকে বলা হলো যে, তোমরা যাকাত আদায় করো, নচেৎ তোমাদের অধিকাংশ দোযখের ইন্ধন হবে; তখন তাদের মধ্য থেকে লালচে কালো বর্ণের একজন মহিলা, যাকে তাদের মধ্যে সম্মানিত মনে হচ্ছিলো অর্থাৎ তিনি এমন এক গোত্র থেকে আগত ছিলেন যাদের বর্ণ কালো ধরনের ছিলো এবং তার মধ্যে লালচে আভাও বিচ্ছুরিত হচ্ছিলো। তিনি আবেদন করলেন, "কেন, হে রসূলাল্লাহ্! আমাদের কেন দোযখের ইন্ধনে পরিণত করা হবে?" তিনি (সাঃ) বললেন, "কেননা, তোমরা বেশী বেশী অভিযোগ করে থাক এবং তোমাদের স্বামীদের অকৃতজ্ঞতা করে থাকো।"

এই যে বেশী বেশী অভিযোগ করার কথা– এক তো ভালোবাসা ও আদর-সোহাগের অভিযোগ হয়ে থাকে, এজন্যে তো দোযখে নিয়ে যায় না; কিন্তু এমন এক প্রকার অভ্যাস আছে যা দুর্ভাগ্যবশতঃ মহিলাদের মধ্যে অধিক পরিলক্ষিত হয় আর তা হলো এই যে, সারা জীবন তার সাথে প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করলেও যদি কখনও অসাবধানতা হয়ে যায় তাহলে কখনও কখনও বলে থাকে যে, সারা জীবন তোমার দ্বারা সুখ-শান্তি পেলাম না। তুমি তো এমনই, সারাটা জীবন ভর তুমি আমাকে কষ্ট দিয়েছো। এই কথাটি সাধারণতঃ মেয়েদের মধ্যে অধিক পরিলক্ষিত হয়, পুরুষদের মধ্যে কম দেখা যায়। নারীদের কমনীয়তা তাদের স্বভাবের অন্তর্গত। কিন্তু তাদের মধ্যে এ দুর্বলতা পরিদৃষ্ট হয়, তজ্জন্য আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলেহি ওয়া সাল্লাম যথার্থই বলেছেন। কিন্তু একথা দোযখের ইন্ধন বানানোর জন্যে যথেষ্ট নয়। এর পেছনে তাই আরও একটি কথা রয়েছে। আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলেহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "মাল্লাম ইয়াশ্‌কুরুন্নাসা লাম ইয়াশ্‌কুরুল্লাহা"– যে ব্যক্তি মানুষের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না সে আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। সুতরাং ইহা চিন্তার বিষয়। কথা তো ইহা নয় যে, ঘরে মেয়েরা অভিযোগ করলেই সোজাসুজি দোযখে নিক্ষিপ্ত হয়। একথার উদ্দেশ্য এই যে, এ বিষয়টিকে হযরত আকদস মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলেহি ওয়া সাল্লামের অন্য একটি উপদেশের সাথে মিলিয়ে যদি পাঠ করা যায় তাহলে কথাটি সুস্পষ্ট হয়। আর কথাটি এই যে, **মানুষের মধ্যে অকৃতজ্ঞতার বড়ই বদ্‌স্বভাব রয়েছে এবং ইহা এমন একটি স্বভাব যা খোদার অকৃতজ্ঞতা পর্যন্ত পৌঁছতে দেয়। আর যে খোদার অকৃতজ্ঞ হয় তার জন্যে তো দোযখ নির্ধারিত।** অতএব আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলেহি ওয়া সাল্লাম ইহা বর্ণনা করে ইহার যে সমাধান বলেছেন উহাও এ বিষয়কে খুবই সুস্পষ্ট করেছে–অধিকতর আলোকজ্জ্বল করছে। তিনি (সাঃ) বলেছেন– যাকাত দাও। খোদার নামে যখন মানুষ কুরবানী উপস্থাপন করে তখন উহা হয় তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থা। ইহা বলা হয়নি যে, স্বামীদেরকে কিছু দান করো। সুস্পষ্ট হয়ে গেলো যে, কেবল স্বামীর অকৃতজ্ঞতার বিষয়ই দৃষ্টিপটে ছিলো না। যদি স্বামীর অকৃতজ্ঞতাই দৃষ্টিপটে থাকতো আর উহাই দোযখে পৌঁছানোর কারণ হতো তাহলে আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলেহি ওয়া সাল্লাম ইহা বলতেন যে, তাদের দেন-মোহর মাফ করে দাও। তাদের আরও কিছু দিয়ে দাও। এর কোন উল্লেখই করা হয়নি। যখন তিনি (সাঃ) ইহা বল্লেন, তখন মহিলারা নিজেদের অলঙ্কারাদি যেমন কানের দুল, কানের রিং, আংটি খুলে খুলে বিলাল (রাঃ) যে চাদর বিছিয়ে দিয়েছিলেন তাতে নিক্ষেপ করা আরম্ভ করলেন। আর অলঙ্কারের ঢের হয়ে গেল। আমি আহমদী মহিলাদের নিকট ইহা এজন্যে বলছি না যে, তারাও এরকম করুক। আমি ইহা বলতে চাই যে, আজ বিশ্বে আহমদী মহিলাগণই এমন যারা ঐ স্মৃতিগুলোকে সঞ্জীবিত করছেন। সারা বিশ্বে কোথাও আহমদী মহিলাদের মত এমন দেখা যায় না। আপনি পূর্ব ও পশ্চিমে দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখুন। চাঁদা প্রদানকারী মহিলাদের তো পাবেন কিন্তু ঐ দৃশ্যাবলী যা কিনা রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলেহি ওয়া সাল্লামের সময়কার ঈদে দেখা যেত আজ বিশ্বের কেউ যদি তা পেশ করে থাকে তাহলে তা আহমদী মহিলারাই পেশ করেছেন। বহুবার এরকম হয়েছে, আর কতিপয় একেবারে সব দিয়ে দিয়েছেন, আবার নতুন তৈরী করে নিয়েছেন, পুনরায় খোদাতাআলার নাম নিয়ে কেউ আহ্বান করলে আবার দিয়ে দিয়েছেন। তাই এজন্যে আমি আপনাদের ভীতি প্রদর্শন করার জন্যে নয়, বরং আপনাদের সুসংবাদ দেবার জন্যে একথাগুলো শুনাচ্ছি যে, আল্লাহ্ করুন আপনাদের আবেগ-অনুভূতিগুলো যেন সদা জীবিত থাকে আর আপনারা তাকওয়ার অলংকারে সুসজ্জিত থাকেন।

যখন আপনারা খোদাতাআলার রাস্তায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে খোদার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে গিয়ে নিজেদের অলঙ্কারাদি দান করেন তখন স্মরণ রাখবেন যে, আপনাদের দ্বারা আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলেহি ওয়া সাল্লামের প্রথম কথাও বড়ই শান ও মর্যাদার সাথে পূর্ণ হচ্ছে। আর সে কথা হলো – **তাকওয়া অবলম্বন করো তাকওয়াই অলঙ্কার– তাকওয়াই আসল সৌন্দর্য।** যে হাত আল্লাহ্‌র খাতিরে কেননা, আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলেহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, খোদার খাতিরে যে অভুক্ত থাকে,

মুখ বন্ধ রাখে তার মুখের গন্ধও আল্লাহ্‌র নিকট প্রিয় মনে হয়। তাই ঐ হাত খোদার নিকট খুবই সুন্দর ও শোভামণ্ডিত দেখায় যা খোদার খাতিরে শূন্য হয়। কিন্তু একথা বলার উদ্দেশ্য এই নয় যে, মহিলারা সর্বদা অলঙ্কার বর্জিত থাকুক। কেননা, অলঙ্কারকে মহিলাদের (দেহের) একটি অংশ নির্ধারণ করা হয়েছে। আর কুরআন করীম অলঙ্কার ও নারীর বিষয়কে একই সূত্রে গেঁথে দিয়েছে। "হিলিয়াতুন"–অর্থাৎ অলঙ্কারের মধ্যে লালিত-পালিত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এজন্যে অবশ্যই একথা বলার উদ্দেশ্য ইহা নয় যে, অলঙ্কার ব্যবহার করাই বাদ দাও–কিছু নিজের জন্যে তৈরী কোর না, কিছু নিজের জন্যে রেখো না। একথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, যখনই সৌভাগ্য হয় তখন ঐসব অলঙ্কার থেকে খোদার নামে কিছু দান করো। আর যদি কিছু না থাকে তাহলে ইহাকেও একটি যাকাত বলা হয়েছে যে, নিজেদের গরীব বোনদের, গরীব মেয়েদেরকে তাদের বিয়ের সময় নিজের অলঙ্কার থেকে স্থায়ীভাবে কিছু না দিতে পারলে সাময়িকভাবে ব্যবহারের জন্যে কিছু দিয়ে দাও। আর কিছুদিন ধরে তারা তা পরিধান করুক, কিছুদিন তাদের অলঙ্কার পরিধানের সাধ মিটে যাক। এই যে কিছু দেয়া, ইহা আসলে সারা জীবনভর আনন্দদায়ক বিষয় হয়ে থাকে। কেননা, মহিলারা সারাদিন অলঙ্কার পরে বসে থাকেন কি? এক আধটা চুড়ি পরে নেয়, এক আধটা কানবালা পরে নিলো। মাত্র কয়েকটি অলঙ্কারই তারা প্রত্যেকদিন ব্যবহার করে থাকে। আর আজকাল তো নকল সোনার (Imitation) অলঙ্কারও এমন তৈরী হয়েছে যে, কেউ যদি জিজ্ঞেস করে তাহলে পরেই কেবল জানতে পারে যে, আসল কি নকল। নচেৎ সাজ-সজ্জার প্রাত্যহিক জিনিষপত্র গরীবদের আয়ত্তে এসে পৌঁছে গেছে। সুতরাং ঐ কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, যদি কোন মানুষ কারও বিয়ে-সাদীর সময়ে, কোন অনুষ্ঠানাদিতে নিজের অলঙ্কার দিয়ে দেয়–হোক না তা সাময়িকভাবে, তাহলে জীবনের কোন কোন উপলক্ষ্যে যখন বড়লোকেরা পরে থাকে ঐসব উপলক্ষ্যে গরীবরাও পরে নেবে, আর তারাও ঐসব আনন্দে অংশগ্রহণ করবে। এসব ক্ষেত্রে আসলে সাময়িক আনন্দও একটি স্থায়ী আনন্দের রূপ ধারণ করবে। উপলক্ষ্যকে সামনে রেখেই তো প্রয়োজন দেখা দেয়। সুতরাং আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলেহি ওয়া সাল্লাম সম্ভাব্য উপলক্ষ্য সম্পর্কে সাময়িকভাবে মহিলাদের উপদেশ দিচ্ছেন যে, নিজেদের পক্ষ থেকে কিছু দিয়ে দাও–পরে ফিরিয়েই নাও না কেন। ঐ হাদীসে পরে ফিরিয়ে নেয়ার কথা উল্লেখ যদিও করা হয়নি কিন্তু মনে করা হয় যে, যেভাবে সাময়িক প্রয়োজনে তোমাদের বোনের প্রয়োজন হয় তাহলে কিছুটা তার প্রয়োজনও পুরো করে দাও। তাই তিনি (সাঃ) বলেছেন–তোমরা অভিযোগ তো অনেকই করে থাকো আর অভিযোগের সমাধান সম্বন্ধে কি বলেছেন অর্থাৎ এ আপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার সমাধান। তিনি (সাঃ) বলেছেন– খোদার রাস্তায় যাকাত দিতে থাকো, এই রেওয়ায়াত সুনানে নিসাঈ-এর কিতাবুস্ সালাতুল ঈদায়েন অধ্যায়েও এবং অন্য অধ্যায় বাবু কিয়ামুল ইমাম ফীল খুতবাহ্-এর মাঝেও এ রেওয়ায়াত বর্ণিত রয়েছে। হুযূর আকরম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলেহি ওয়া সাল্লামের ঈদ পালনের আরও একটি পদ্ধতি সহী বুখারীর কিতাবুল ঈদায়েন-এর মধ্যে এভাবে বর্ণিত হয়েছে। আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলেহি ওয়া সাল্লাম ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন ঈদের মাঠে যেতেন। সর্বপ্রথম তিনি (সাঃ) নামায পড়াতেন। সালাম ফিরানোর পর লোকদের দিকে মুখ করতেন এবং তাদের সামনে দাঁড়িয়ে খুৎবা দিতেন। লোকেরা তাদের কাতারে বসে থাকতেন। তিনি (সাঃ) তাদের উপদেশ দিতেন, ভালো ভালো কাজের আদেশ দিতেন এবং অন্যান্য বিষয়াদি সম্পর্কে অবহিত করতেন বা তিনি কোন সেনাবাহিনী প্রেরণ করতে চাইতেন তাহলে তাদের প্রেরণের ঘোষণাও দিতেন। অর্থাৎ ঈদের দিনে যেহেতু বহু লোক সমাগম হতো তাই তিনি (সাঃ) বলতেন, যখন এই অভিযানে ইসলামের একটি সেনাবাহিনী প্রস্তুত, যে যোগ দিতে চায় সে যোগ দিতে পারে। আর আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলেহি ওয়া সাল্লাম যেসব আদেশ ঘোষণা করেছিলেন সাধারণতঃ দ্বিতীয়বার এ সুযোগে জোর দিয়ে তা পুনরাবৃত্তি করতেন। এর পরে তিনি (সাঃ) ফিরে যেতেন।

সুতরাং এক স্থানে ঈদের পর মহিলাগণের নিকট যাওয়ার উল্লেখ এসেছে। অন্য স্থানে এ কথা বলা হয়েছে যে, তিনি (সাঃ) ফিরে চলে যেতেন। বিভিন্ন লোক বিভিন্নভাবে দেখেছে, আর ঈদ যেহেতু এ যুগেও এখনও খুবই বিস্তৃত হয়ে পড়েছে এবং বহু লোক যোগ দেয় এজন্যে ইহা আবশ্যক নয় যে, সব লোক সব কিছু দেখে। যারা নিকটে থাকে তারা বেশি বেশি দেখতে পারে, যারা তুলনামূলকভাবে দূরে থাকে তারা কম দেখে থাকে।

ঈদের পরের যে দৃশ্যাবলী তা-ও রেওয়ায়াতগুলোতে সংরক্ষিত রয়েছে। গোটা-টা তো নেই কিন্তু কিছু না কিছু এমন হৃদয়গ্রাহী দৃশ্য রয়েছে যা আমি এখন আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি।

* হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা বর্ণনা করেছেন যে, একবার ঈদের দিনে আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলেহি ওয়া সাল্লাম আমার নিকট আসলেন। ঐ সময়ে আমার নিকট দু'টি বালিকা যুদ্ধ-বিগ্রহের ওপরে ভিত্তি করে রচিত গাঁথা গাচ্ছিলো। আরবদের কাহিনী অবলম্বনে গীত গাওয়া হচ্ছিলো। এর সাথে কিছু বাদ্য যন্ত্রও বাজছিলো যার তালে তালে তারা নাচ্ছিলো। অর্থাৎ ওগুলো কী ধরনের বাদ্য যন্ত্র ছিলো সে সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়নি। কিন্তু কোন কোন বাজনা এমন ছিলো যা আরব দেশে প্রচলিত ছিলো, সেগুলোও বাজানো হচ্ছিলো। আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলেহি ওয়া সাল্লাম আসলেন। মুখ অন্য দিক করে শুয়ে গেলেন এবং শুনতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরে হযরত আবুবকর (রাঃ) আসলেন আর তিনি (রাঃ) আমাকে ধমকালেন এই বলে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের নিকট শয়তানী যন্ত্র বাজানো হচ্ছে! এখন এই যে, 'শয়তানী যন্ত্র' শব্দটি আসলে অপর একটি হাদীসে পাওয়া যায়। একবার দূর থেকে সম্ভবত: বাঁশী অথবা অন্য কিছুর শব্দ আসছিলো সেক্ষেত্রে আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম-এর প্রসঙ্গে বর্ণনা এসেছে যে, তিনি (সাঃ) দু'টো আঙ্গুলই

কানে দিয়ে বল্লেন, এ যে শয়তানী সুর আসছে। এখন প্রশ্ন হলো, ইহা কি ঐ অর্থে শয়তানী যে, সব সময়ের জন্যে বন্ধ বা ঐ যুগে শয়তানী রীতি-নীতি যা কিনা এসব গানের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকতো.....আসর জমতো, ও বিভিন্ন মেলা উপলক্ষ্যে গান গাওয়া হতো। বাদ্যও বাজানো হতো এবং বিভিন্ন শয়তানী অঙ্গ-ভঙ্গিও করা হতো। অথবা এর অর্থ ইহাও হতে পারে যে, ভবিষ্যতে শয়তান এসব যন্ত্রাদির বহুল পরিমাণে ব্যবহার করবে আর সারা বিশ্বের পরিবেশকে গান প্রভৃতির দ্বারা ধ্বংস ও বিনাশ সাধন করবে। খোদাতাআলার প্রশংসা কীর্তন করার দিকে মনোযোগ দেবার পরিবর্তে মানবীয় স্বভাব এসব কৃত্রিম গান-বাদ্যের পেছনে পড়ে ঐ সবের মধ্যে নিজেদের জীবন বিনাশ করবে। হতে পারে যে, ইহা একটি ভবিষ্যদ্বাণীর মত ছিলো।

কিন্তু এর সঠিক ব্যবহারের প্রসঙ্গে এখন এই হাদীস রয়েছে যে, ইহা স্বভাব-বিরুদ্ধ নয়। অতএব হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর মস্তিষ্কে সম্ভবতঃ এ কথাই থেকে থাকবে এবং আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলেহি ওয়া সাল্লাম-এর উপস্থিতিতে হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে উদ্দেশ্য করে এ কথা বলা দ্বারা ইহা সুস্পষ্ট বলে দিচ্ছে যে, তিনি অনুমান করেছিলেন যে, আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলেহি ওয়া সাল্লাম প্রকৃতি ও স্বভাবগত কারণে খুবই লজ্জাশীল এবং কারও মর্ম পীড়ার সকল প্রকার পথকে এড়িয়ে চলতেন। এজন্যে হতে পারে যে, অপসন্দ তো করতেছিলেন আর যেহেতু অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে রেখেছিলেন এতদ্দ্বারা সম্ভবতঃ ইহা অনুমান করেছিলেন যে, অপসন্দের অভিপ্রকাশ ছিলো কিন্তু আয়েশা বুঝতে পারেন নি।

কিন্তু এর মধ্যে আরও একটি দিক রয়েছে যে, যদি শরীয়তের দিক থেকে অসিদ্ধ মনে করতেন তাহলে আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলেহি ওয়া সাল্লাম-এর স্বভাবজ লজ্জা কখনও এ কথায় বাধ সাধতে পারতো না। এক তো হলো পসন্দ, আর না পসন্দের ব্যাপার; বরং অনুমানের ত্রুটি যা কিনা 'লামাম' শব্দের কাছাকাছি রয়েছে তা অন্য ব্যাপার, কিন্তু 'লামাম' নয়, 'লামাম'-এর সাথে কাছাকাছি হওয়ার ব্যাপারটি নিকটতর; কিন্তু ইহা যে, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলেহি ওয়া সাল্লামের সম্মুখে তাঁর (সাঃ) গৃহে তাঁর পবিত্র গৃহিণী শরীয়তের বিধান লংঘন করছেন এবং রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলেহি ওয়া সাল্লাম ঘরে থাকা অবস্থায় এ শয়তানী বাজনা বাজানো হচ্ছে। এতে হুযূর (সাঃ) হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর দিকে মনোযোগী হলেন এবং বল্লেন, আরে, এ বালিকাদের কিচ্ছু বলো না। যখন হুযূর (সাঃ)-এর দৃষ্টি অন্য দিকে নিবদ্ধ হলো তখন আমি (হযরত আয়েশা-অনুবাদক) ইঙ্গিত করলাম এবং তারা চলে গেল। তিনি বল্লেন, যাও এখন ঠিক আছে। আর এক ঈদের দিন – ঈদের দিনই তো ছিলো। আর এক ঈদের দিনেই তিনি (হযরত আয়েশা- রাঃ) বলেন যে, হাবশী লেজা ও বর্শা দ্বারা খেলছিলো। আমার জিজ্ঞেস করাতে বা তিনি (হযরত আয়েশা রাঃ) বলছেন যে, সম্ভবতঃ তিনি (সাঃ) নিজেই বলেছেন। পুরোপুরি আমার মনে নেই যে, আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম তাই তিনি বল্লেন, নাকি নিজেই স্বেচ্ছায় বল্লেন এবং স্বয়ং আমাকে বল্লেন যে, তুমি কি দেখতে চাও। আমি বল্লাম, 'হ্যাঁ'। এর ওপরে তিনি (সাঃ) আমাকে তাঁর ঘাড়ের পেছনে দাঁড় করিয়ে নিলেন। আমার গণ্ডও তাঁর গণ্ডের পার্শ্বে ছিলো। এখন ইহাও দেখুন যে, কতই না এক পবিত্র দৃশ্য ছিলো! আর এসব মৌলবীয়ানা মন-মানসিকতার জন্যে এর মধ্যে একটি শিক্ষা রয়েছে। কতক লোক তো এরকম আছেন যে, লোকদের সামনে নিজ স্ত্রীর হাত ধরতেও অথবা বেড়াতে যেতে নিয়ে বা কখনও এয়ারপোর্ট বা অন্য কোন স্থানে গেলে তো মৌলবীদের গাত্র দাহ আরম্ভ হয় যে, দেখো! কি কারবার? আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলেহি ওয়া সাল্লাম কোন এক দল হাবশীদের খেলা–ধূলা দেখছেন। অন্য লোকেরাও আছে। এদিকেও হয়ত দৃষ্টি পড়ে থাকবে। যদিও বা মুসলমানদের পড়ে থাকবে তাহলে তারা হয়ত (শরমে) মাথা নত করেও নিয়ে থাকবে। আজও তো মুসলমানই রয়েছে যারা অভিযোগ উত্থাপন করছে। তাদের দৃষ্টি কেন অবনত হয়ে যায় না। প্রশ্ন হলো এই যে, যা কিছু আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলেহি ওয়া সাল্লাম দেখছিলেন, হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ)-ও উঁকি দিয়ে ঐ ভাবেই দেখছিলেন। মাথা সামনে আগে বেড়ে ছিলো এবং গণ্ডে গণ্ডে লেগেছিলো। তিনি বলেছেন এভাবে আমাকে দাঁড়া করলেন যে, গণ্ডের পার্শ্বে গণ্ড ছিলো। তিনি তাকে বলছিলেন, হে বনী ইরফাদাহ! তোমাদের খেলা চালাতে থাকো। তারা থামতে গেলে তিনি (সাঃ) বল্লেন, না চালাতে থাকো। চালাতে থাকো। এ পর্যন্ত যে, যখন (আমি হযরত আয়েশা (রাঃ)) ক্লান্ত হয়ে গেলাম। তখন তিনি বল্লেন, 'হয়েছে কি?' আমি বল্লাম, 'হ্যাঁ'। তিনি বল্লেন, 'এখন যাও।' তাই ইহা ঈদ পালনের একটি পদ্ধতি ছিলো যদ্বারা আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলেহি ওয়া সাল্লাম ঈদের নামাযের পরে সময় কাটাতেন। ইহা তারই একটি দৃশ্য। এক হাদীস থেকে – অন্য একটি হাদীস দৃষ্টিপটে এসে গেল যে, এভাবে নয়। কেননা, উহা পেছনে ঝুলে থাকতো আর আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলেহি ওয়া সাল্লাম এরূপ করতে নিষেধ করেছেন। ধনীরা নিজেদের ঠাট্ বজায় রাখতে এক প্রকার পোষাক পরে থাকে যা কখনও কখনও এখানে রাজ পরিবারে পরার প্রচলন ছিলো। উহা এই যে, রাণীর পোষাকের পেছনে লম্বা একটি কাপড় মাটিতে গড়িয়ে গড়িয়ে যেতো উহাকে কতিপয় মহিলা, যারা নিজেরাও সম্ভ্রান্ত, লেজের ন্যায় ধরে ধরে হাঁটতেন আর ইহা ছিলো রানীর শান ও মর্যাদার অন্তর্ভুক্ত। এইসব শান ও মর্যাদা যখন বেড়ে যায় তখন উহা এ ধরনের হাসি-ঠাট্টাপূর্ণ কৌতুকপূর্ণ দৃশ্যাদি সৃষ্টি করে দেয়। যেহেতু আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলেহি ওয়া সাল্লাম ইহা পসন্দ করেন নি এজন্যে আমি বের করে নিয়েছি, যখন পরেছি তখন আমি বল্লাম, এখন তো খুবই সঙ্কট। বাধ্য হয়েছি এজন্যে খুলে এসেছি। কিন্তু যেহেতু ঐ সুন্নত পূর্ণ করার নিয়্যত ছিলো এজন্যে আমি আশা করি যে, আল্লাহ্র নিকট আমি এ সুন্নত পূরণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবো। কিন্তু যেভাবে একটি হাদীস অপর একটি হাদীসের মোকাবেলায় দাঁড়িয়ে যায় তখন একটি বিজয় লাভ করে, আর অন্যটি হয় পরাভূত। এর অন্য একটি দৃষ্টান্ত হাদীসে

রয়েছে। আমি আপনাদের সামনে তা উপস্থাপন করছি যা কোন জুব্বার সাথে সম্পর্কিত।

আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলেহি ওয়া সাল্লামের সকাশে এক বার হযরত উমর (রাঃ) নিজের পক্ষ থেকে খুবই সুন্দর একটি রেশমের তৈরী জুব্বা নিয়ে আসলেন এবং আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলেহি ওয়া সাল্লামের নিকট গিয়ে বল্লেন, "হে আল্লাহ্‌র রসূল! ঈদের দিন যখন আসে ঐ সময় হুযূর আকরম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম যেন এটা পরিধান করে আসেন। তিনি (সাঃ) শেষে বল্লেন, ইহা তাদের পোষাক যাদের আখেরাতের কোন অংশ নেই অর্থাৎ রেশমের পোষাক পুরুষদের সজ্জিত করে না। আর যদি পুরুষেরা রেশমের পোষাক পরিধান করে তাহলে পরে তাদের আখেরাতের পোষাকের মধ্যে কোন অংশ থাকবে না। তাই এভাবে ইহা পরস্পর বিরোধী হাদীস নহে। একটি নিজস্ব সাধারণ আদেশের কারণে বিজয়ী, একটি পরাভূত নিজস্ব বিশেষ পরিমণ্ডলের আলোকে। এখন মহিলাদের জন্যে নিষিদ্ধ নহে পুরুষদের জন্যে নিষেধ।

এখন ঐ যে পুরুষ সম্পর্কিত হাদীস আছে তা বিজয়ী, খুব সুন্দর (পোষাক) যেভাবে পরিধান করা সিদ্ধ অথচ রেশমেরটি নয় অথবা এর ওপরে আসলে স্বর্ণের কাজ নাইবা হোক। অতএব এভাবেই ইস্তেমবাত, বা প্রতিপাদন (অর্থাৎ কোন যুক্তি ও দলীলের ওপরে ভিত্তি করে নতুন কোন বিষয়ে যুক্তি ও দলীল গ্রহণ-অনুবাদক) হয়ে থাকে। আর আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলেহি ওয়া সাল্লাম কয়েকবার জুব্বা পরিধান করেছেন – এবং কতক বর্ণনায় এসেছে যে, খুবই সুন্দর জুব্বা পরেছেন, কোন কোন জুব্বা এমন সুন্দর ছিলো যে, এক বর্ণনাকারী বর্ণনা করেন যে, চাঁদনী রাত ছিলো যখন রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলেহি ওয়া সাল্লাম বাইরে বের হলেন। আমি কখনও চাঁদের দিকে তাকাতাম কখনও রসূলুল্লাহ্‌র দিকে। এমনই সুন্দর দেখাচ্ছিলো যে, চাঁদের রং ফিকে মনে হচ্ছিল। এর কোন মূল্য বা যোগ্যতাই ছিলো না। তাই সৌন্দয মু'মিনের শান ও মর্যাদার পরিপন্থী নয়। কিন্তু ঐ সৌন্দর্য যা তাকওয়ার পরিমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত হয় যার ওপরে লিবাসুত্ তাকওয়া (তাকওয়ার পোষাক)-এরও প্রয়োগ হতে পারে। লিবাসুত্তাক্ওয়া- কে পরিত্যাগ করে আবার কোন সৌন্দর্য সৌন্দর্যই থাকতে পারে না।

* সুনানে ইব্‌নে মাজাহ্ হাদীসে আছে যে, আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলেহি ওয়া সাল্লাম ঈদের জন্যে পায়ে হেঁটে যেতেন। কেননা, ঈদের নামাযের স্থান অধিকাংশ সময়ে বাইরে হোত। এ জন্যে সেখানে যাবার জন্যে যান-বাহনেরও ব্যবহার হতে পারতো; কিন্তু আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলেহি ওয়া সাল্লাম বলতেন, "ঈদের জন্যে পায় হেঁটে যাও।" আর বাল্যকালে কাদিয়ানের কথা আমার মনে পরে। ঈদগাহের নিকটে একটি পুরনো কবরস্থান ছিলো। যখন উহার নিকটস্থ খেলার মাঠে ঈদের নামায হোত তখন সেখানে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ (রাঃ)ও পায়ে হেঁটে যেতেন আর আমরা সবাই পিছনে পিছনে দৌড়ে দৌড়ে যেতাম। ছোট খাটো একটা মিছিলের রূপ ধারণ করতো। আর এভাবে পায়ে হেঁটেই ফিরে আসতেন এবং ফেরার সময়ে রাস্তা বদল করে ফিরতেন। কেননা, আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলেহি ওয়া সাল্লাম-এরও এই রীতি ছিলো। সুতরাং মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সাঃ) পায়ে হেঁটে যেতেন। যে রাস্তায় যেতেন ফেরার পথে অন্য রাস্তায় ফিরে আসতেন। অর্থাৎ যাওয়ার রাস্তার কিছু অংশ যদি আসার রাস্তার অংশও হয়ে যায় তাহলে ঐ রাস্তা বাদ দিয়ে অন্য রাস্তায় গেলে পরে রাস্তা দু'টোই হয়ে যায়। এর উদ্দেশ্য এই যে, এখন আমারও যাওয়ার সময়ে অন্য পথে যেতে হবে। পাহারাদার যেন এখানে না দাঁড়ায়। দ্বিতীয় বড় দরজাটা যেন খুলে দেয়া হয়।

* সুনানে আবূ দাউদ নামক গ্রন্থের কিতাবুস্ সালাত অধ্যায় আছে। হযরত সালাম বিন মালিক (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত যে, আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম মদীনা গেলেন। তখন তিনি ঐ দু'টি দিন প্রতিবছরই পালন করতেন। অর্থাৎ হুযূর আকরম যখন মদীনায় হিজরত করে গেলেন তখন মদীনা বাসীরও দু'টি ঈদের দিন ছিলো। যদিও উহা ইসলামী ঈদ ছিলো না কিন্তু অন্য দিন ছিলো। বছরের ঐ দিনগুলোতে তারা খেলা-ধূলার ব্যবস্থা করতো। আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলেহি ওয়া সাল্লাম বলেন যে, আল্লাহ্‌তাআলা উহার বদলে তোমাদের জন্যে দু'টি উত্তম দিন নির্ধারণ করে দিয়েছেন। অর্থাৎ ঈদুল আযহিয়া ও ঈদুল ফিতর। এ বর্ণনাই সুনানে নিসাঈ কিতাবুস্ সালাত 'ঈদায়েন' শীর্ষক অংশে বিদ্যমান আছে।

সুনানে ইবনে মাজাহ্ 'কিতাবুল একামাতিস্ সালাত' অধ্যায়ে লেখা আছে, মুগীরা বিন আমের বলেন যে, আয়ায্উল আশ'আরী ঈদের দিনে আল্ আম্বার চলে গেলেন (আল আম্বার একটি স্থানের নাম) এবং বল্লেন, কি কারণে আপনারা দফ বাজিয়ে গীত গাচ্ছেন না যেভাবে আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলেহি ওয়া সাল্লামের সময়ে গাওয়া হতো অর্থাৎ হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ)-এর বর্ণনা তো এই যে, ঘরে এ ঘটনা ঘটছিলো, কিন্তু উহার সংবাদ অবশ্যই ছড়িয়ে পড়ছিলো এবং সাহাবাদের মধ্যেও এ রীতি ছিলো যে, ঐ যুগে ঈদের দিনে যেভাবেই সাদা-সিদা সুর ছিলো মহিলারা দফে তা বাজিয়ে ঘরে গাইতেন এবং আনন্দের দিন গানের সাথে পালন করতেন। বুখারীর 'কিতাবুল ঈদায়েন' অধ্যায় হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ্ বর্ণনা করেন যে, হুযূর (সাঃ)-একবার নামায পড়ালেন এবং পরে খুৎবা দিলেন, যখন তিনি অবসর হলেন তখন মহিলাদের দিকে চলে গেলেন এবং তাদেরকে উপদেশ-নির্দেশ দিলেন। তিনি এ সময়ে হযরত বেলালের কাঁধে হাত রেখে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এই বর্ণনাও ঐ ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করছে যে, – ইহা শেষ জীবনের অংশ ছিলো যখন শরীরে দুর্বলতা আসলেই এসে গিয়েছিলো। হযরত বেলাল (রাঃ) কাপড় বিছালেন যার মধ্যে মহিলাগণ সদকা, যাকাত প্রভৃতির টাকা ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছেলেন। (অসমাপ্ত) (১-৫-৯৭ তারিখের বদরের সৌজন্যে)।

অনুবাদ-মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

ইনকিলাবে হাকীকী
(প্রকৃত বিপ্লব)

মূল : হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)

(ত্রয়োদশ কিস্তি)

সভ্যতা-সংস্কৃতির অনুশাসনের কল্যাণরাজি :

আপনারা আজ এ কথাগুলোকে সাধারণ মনে করেন এবং এ নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করেন। কিন্তু প্রথম প্রথম আদম যখন এ কথাগুলো লোকদের সামনে উপস্থাপন করে থাকবেন, জাতির পর জাতি আদমের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গিয়ে থাকবে। যখন আদম তাদেরকে বলে থাকবেন যে, কাপড় পরিধান করো তখন কতিপয় গোত্র বিদ্রোহ করে থাকবে আর তারা ইহা বলা আরম্ভ করে দিয়ে থাকবে যে, ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষার খাতিরে দণ্ডায়মান হয়ে যাও। এ জন্যেই আল্লাহ্তাআলা আদম ও তাঁর সঙ্গীগণকে ঐসব দলীল-প্রমাণ শিখান যে, কেন তোমাদের ব্যবস্থাপনার প্রতি আনুগত্য তোমাদের জন্যে কল্যাণপ্রদ হবে। আল্লাহ্তাআলা বলেন, হে আদম! যখন লোকেরা আপত্তি উত্থাপন করে এবং বলে যে, এ সভ্যতা, সংস্কৃতি-ভিত্তিক শাসন ব্যবস্থায় কী লাভ? তখন তুমি তাদেরকে বলে দাও যে, যদি তোমরা এ ঐশী ব্যবস্থার অধীনে থাকো তাহলে অভুক্ত থাকবে না, নগ্ন থাকবে না, পিপাসার্ত থাকবে না এবং রৌদ্রে তোমাদের কষ্ট করতে হবে না। আর ইহাই ধর্ম-ভিত্তিক শাসন ব্যবস্থার অবশ্য কর্তব্য যে, উহা দেশে মঙ্গলের সুব্যবস্থা করে। লোকেরা ভুলে কুরআন করীমের এই আয়াতের অর্থ এভাবে করেছে যে, আদমকে এমন স্থানে রাখা হয়েছিলো যেখানে ক্ষুধা লাগে না, পিপাসা লাগে না। অথচ ইহা সর্বৈব ভুল। এর মধ্যে আসলে বলা হয়েছে যে, ইসলামী সরকারের ইহা অবশ্য কর্তব্য যে, উহা যেন লোকদের জন্যে কাজের সংস্থান করে। যদি কেউ কাজ করতে না পারে তার খাবার সংস্থান করে। পানির জন্যে পুকুর খনন করে। আর আবাস-গৃহের ব্যবস্থা করে। মোট কথা খাদ্য, পানি, বাসস্থান ও পরিধান এ চারিটি জিনিষ সরকারের দায়িত্বে। আর এই চারিটি বিষয়ই – ইন্না লাকা আল্লা তাজূ'আ ফীহা ওয়ালা তা'রা-ওয়া আন্নাকা লা তাযমাউ ফীহা ওয়ালা তাযহা-অর্থাৎ নিশ্চয় এতে তোমার জন্যে (বিধি ব্যবস্থা) রয়েছে যে, তুমি এতে ক্ষুধার্ত থাকবে না, এবং নগ্নও থাকবে না, আর তুমি এতে তৃষ্ণার্ত থাকবে না ও রৌদ্রেও পুড়বেনা (সূরা ত্বা-হা: ১১৯-১২০)-এর মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে। হে আদম! যদি লোকেরা আপত্তি উত্থাপন করে তাহলে তুমি বলে দাও যে, সরকারের প্রথম কল্যাণপ্রদ কাজ এই হবে যে, তোমরা ক্ষুধার্ত থাকবে না। যেমন সরকারের এই কর্তব্য যে, যদি কেউ জঙ্গলেও পড়ে থাকে তার খাবারও যেন সংস্থান করা হয়। ওয়ালা তা'রা–এবং পুনরায় তোমরা নগ্নও থাকবে না। কেননা, তোমাদের কাপড়ের জন্যেও সরকার জিম্মাদার হবে। এমনি ভাবে লা তাযমাউ-এর মধ্যে বলা হয়েছে যে, সরকার তোমাদের পানির জন্যেও জিম্মাদার হবেন। আর ওয়ালা তাযহা-এর মধ্যে বলা হয়েছে যে, তোমাদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হবে। আর যে সরকারের দায়িত্ব এ চারিটি বিষয় থাকে উহা নেহায়েৎ উচ্চস্তরের পরিপূর্ণ নিরাপত্তা বিধানকারী সরকার হয়ে থাকে।

অতএব এ আয়াতে আল্লাহ্তাআলা ইহা বলেছেন যে, নিঃসন্দেহে, ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ওপরে হস্তক্ষেপে কিছু কষ্ট থাকলেও–কিন্তু তোমাদের কল্যাণ এর মধ্যে নিহিত যে, ব্যবস্থাপনার খাতিরে কিছু বাধ্য-বাধকতা গ্রহণ করো। কেননা, উহা ব্যতিরেকে না ক্ষুৎপিপাসা, না পোষাক-আশাক ও বাসস্থান আর না দীর্ঘস্থায়ী নিরাপত্তা অর্থাৎ জান্নাতের ব্যবস্থা হতে পারে। অতএব এ প্রতিবন্ধকতা তোমাদের কল্যাণের খাতিরে।

যেহেতু আদমের সময় পর্যন্ত মানুষের মেধা-মস্তিষ্ক পুরোপুরি বিকাশ লাভ করেনি এবং পাপের পূর্ণ ব্যাপ্তি লাভ হয় নি, কেবল কতিপয় ব্যতিরেকে তাই তাদের জন্যে কতিপয় আদেশ-নিষেধ জারী করা হয়েছিলো। আর উহা এ পর্যন্তই ছিলো যা কিনা ব্যবস্থাপনা-ভিত্তিক শাসনের জন্যে কুরআন করীমে কোথাও উল্লেখ নেই যে, তিনি লোকদেরকে শরীয়তের মসলা-মাসায়েল শিখাতেন। যেখানে উল্লেখ এসেছে, ঐ চারিটি বিষয়েরই উল্লেখ এসেছে।

অতএব হযরত আদম কেবল দুনিয়াকে সভ্য ও সংস্কৃতিবান বানিয়েছিলেন। কিন্তু ইহা ঐ সময়ের জন্যে একটি বিপ্লব ছিলো। এবং প্রকৃতপক্ষেও একটি মহান বিপ্লব যে, দুনিয়ার সমকালীন সভ্যতা-সংস্কৃতি উহারই ফসল।

দ্বিতীয় পর্যায়ে হযরত নূহ (আঃ)-এর আন্দোলন

এর পরে দ্বিতীয় পর্যায় আসলো। যখন আস্তে আস্তে আদমের অনুসারীবৃন্দ উন্নতি করলো। আর তারা দুনিয়াকে পথ-প্রদর্শনের কাজ আরম্ভ করে দিলো এবং মানব-সভ্যতা উন্নতি করতে থাকলো। সভ্যতা-সংস্কৃতির সাথে মানুষের যে ভয়-ভীতির সম্পর্ক চলে আসছিলো তা বিলুপ্ত হতে থাকে, এবং তারা এ কথায় অভ্যস্ত হয়ে গেলো যে, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা জলাঞ্জলি দিয়ে সামগ্রিকভাবে জাতির কল্যাণার্থে পদক্ষেপ রাখা হোক। এর ফলে এগিয়ে চলার শক্তি সৃষ্টি হয়। কতক তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি-সম্পন্ন লোক বেরিয়ে আসে। আর কতক লোক স্বল্প-বুদ্ধি-সম্পন্ন বলে প্রমাণিত হয় । কেউ স্বীয় কাজকর্মে খুবই দক্ষ বলে প্রমাণিত হয় এবং কেউ নিষ্কর্মা। কেউ নিজস্ব প্রতিভা বলে বহু আগে বেড়ে যায় এবং কেউ পিছে পড়ে থাকে। কেননা, বিভিন্ন মানুষের শক্তি-সামর্থ্যে পার্থক্যতো হয়েই থাকে। কিন্তু এর অভিপ্রকাশ ঘটে থাকে সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক জীবনে। আর সভ্যতা ও সংস্কৃতি যতটা প্যাঁচালো ও সূক্ষ্ম হতে থাকে মানবীয় যোগ্যতাসমূহের মধ্যেও ততটা পার্থক্য সুস্পষ্ট হতে থাকে। যদি দু'টো ভিন্নধর্মী শক্তি ও সামর্থ্য মানুষের সাধারণ সভ্যতা-সংস্কৃতির অঙ্গণে কাজে লাগানো যায় তাহলে পার্থক্য তো পরিস্ফুট হবে কিন্তু ততটা পরিস্ফুট হবে না

যতটা হবে উন্নততর সভ্যতা-সংস্কৃতির মাধ্যমে কাজ করতে হলে। উন্নত সভ্যতা-সংস্কৃতিতে তো কখনও পার্থক্য এতটা পরিলক্ষিত হয়ে থাকে যে, এক উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষকে অন্য কোন শ্রেণী বলে পরিদৃষ্ট হয়। সুতরাং এমনভাবেই আদমের শেষ পর্যায়ে পরিদৃষ্ট হতে লাগলো। আর ফল এই দাঁড়ালো যে, যে-ব্যক্তি সাধারণ ছিলো সে কতক ব্যক্তিকে বিশেষ যোগ্যতার অধিকারী মনে করে নিলো। আর যেহেতু মনোবিজ্ঞানের দর্শন তখনও প্রকাশিত হয়নি এবং জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে ঐ যুগের লোক এ ধারণা করতো যে, সব মানুষ একই প্রকারের হয়ে থাকে। এবং যদি তাদের মধ্য থেকে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কেউ বেরিয়ে আসে তাহলে অবশ্যই সে কোন অতি মানবীয় শক্তির অধিকারী।

পাপ কীভাবে উন্নতি করলো ঃ

এ জন্যে ঐ সব লোকদের মধ্যে প্রথম যে অনুভূতি জেগেছিলো তাহলো শিরকের বা অংশীবাদিতার। আর তারা তাদের মধ্য থেকে কতককে খোদাই শক্তিসমূহ দ্বারা গুণান্বিত বলে মনে করে নিয়েছে আর এ রকম ধারণা করতে লেগে গেছে যে, অমুক ব্যক্তি যিনি কিনা এতটা যোগ্য, এতটা পরামর্শদাতা, এতটা সমঝদার, ও এতটা জ্ঞানী ছিলেন যে, তিনি মানুষ ছিলেন না বরং খোদা ছিলেন। যদি খোদা না হতেন তাহলে তার যোগ্যতা আমাদের থেকে বেশি হত না। এভাবে শির্কের গোড়া পত্তন হলো। যখন চিন্তা-শক্তি বিকাশের ফলে একদিকে তো শির্কের ব্যাধিগুলো লোকদের অন্তরে সৃষ্টি হয়ে গেলো আর অন্য দিকে মানুষের অন্তরে ঐ সব পাপ সৃষ্টি হতে থাকলো যা প্রকৃতপক্ষে সভ্যতা সংস্কৃতির অবশ্যম্ভাবী ফসল। ঐ সময়ে আল্লাহ্তাআলা হযরত নূহ্ (আঃ)-কে পাঠালেন।

দ্বিতীয় পর্যায়ের বাণী – শরীয়ত বা বিধি-বিধানের অবতরণ ঃ সুতরাং ইহা ছিলো ঐশী সভ্যতা-সংস্কৃতির দ্বিতীয় পর্যায় যা নূহ থেকে আরম্ভ হয়েছে। নূহ ঐ সময়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন যখন লোকদের অন্তরে ঐশী-গুণাবলীর অনুভূতির সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিলো এবং ঐশী-গুণাবলীর অনুভূতির পরেই শরীয়তের অনুভূতি সৃষ্টি হয়। এ জন্যেই রসূলে করীম সাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া সাল্লাম হযরত নূহ সম্বন্ধে বলেছেন যে, আওওয়ালু নাবীয়্যিন শুরি'আত 'আলা লিসানিহিশ্শারাই'উ অর্থাৎ নূহ ঐ প্রথম নবী ছিলেন যার ওপরে শরীয়ত অবতীর্ণ হয়েছিলো। আর সভ্যতা-সংস্কৃতির রংকে একটি স্থায়ী নিয়ম-কানুনের রং প্রদান করেন। কেননা, ঐ যুগে মানবীয় মস্তিষ্ক উন্নতি করে এরূপ উচ্চ--মার্গে পৌছে গিয়েছিলো যে, উহার জন্যে এ ধরনের পথ-প্রদর্শকের প্রয়োজন ছিলো। সুতরাং হাদীসে এসেছে যে, আওওয়ালু নাবীয়্যিন-শুরি'আত 'আলা লিসানিহিশ্-শারাই'উ-এর বিষয়-বস্তু কুরআন শরীফেও পাওয়া যায়। ইন্না আওহায়না ইলায়কা কামা আওহায়না ইলা নূহিন ওয়ান্নাবীঈনা মিম বা'দিহী (অর্থাৎ নিশ্চয় আমরা তোমার নিকট ওহী করেছি যেভাবে নূহ এবং তার পরে নবীগণের নিকট ওহী করেছি (সূরা নিসা : ১৬৪ আয়াত)। হে মুহাম্মদ! সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম আমরা তোমার প্রতি যে ওহী অবতীর্ণ করেছি ইহা ঐ রকম ওহীই যেরূপ ওহী নূহ এবং তার পরে নবীগণের প্রতি অবতীর্ণ করেছিলাম। তাই প্রথমে ওহী ধর্মীয়-বিশ্বাসের ব্যাপারে নূহের নিকট হয়েছিলো। আর সবচে' আগে ঐশী-গুণাবলীর বিস্তারিত বিবরণের দরজা তাদের নিকটে প্রকাশ করা হয়েছিলো। কেননা, ঐ সময় পর্যন্ত মানবীয় মেধা-মস্তিষ্ক অনেক উন্নতি সাধন করেছিলো। আর মানুষের মস্তিষ্ক ঐশী-গুণাবলী সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা আরম্ভ করেছিলো ও ঐ চেষ্টায় ঘাত-প্রতিঘাত খেয়ে খেয়ে শির্কের বিশ্বাস উদ্ভাবন করেছিলো। সুতরাং কুরআন করীমে শির্কের উল্লেখ নূহ-এর উল্লেখের সাথেই আরম্ভ হয়।

অতএব নূহ ছিলেন প্রথম শরীয়তধারী নবী, এই অর্থে যে, তাঁর যুগে মানুষ আধ্যাত্মিকতার সূক্ষ্ম পথসমূহে বিচরণ করতে লেগে গিয়েছিলো আর তাদের মস্তিষ্ক প্রাকৃতিক ব্যবস্থাপনার উর্ধ্বের বিষয়-বস্তুকে বুঝার চেষ্টায় লেগে গিয়েছিলো।

তৃতীয় পর্যায় : ইব্রাহিমী আন্দোলনঃ

এর পরে তৃতীয় পর্যায় হলো ইব্রাহীম (আঃ)-এর যুগের। যদিও নূহ (আঃ)-এর ব্যাপারে কুরআন করীম থেকে জানা যায় যে, তাঁর যুগে শিরক মাথা চারা দিয়েছিলো আর তিনি কঠোরতার সাথে তা দমন করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঐ যুগ-পর্যায় ছিলো ঐশী-গুণাবলীর অনুভবের প্রাথমিক অবস্থা এবং শিরকও প্রাথমিক আকৃতিতে অবস্থান করছিলো। কতক লোক সম্মানিত লোকদের প্রতিমূর্তি পূজো করতে লেগে গিয়েছিলো। অন্যান্য কতক লোক অন্যান্য সাদা-সিদা ধরনের শিরক অবলম্বন করে নিয়েছিলো। কিন্তু ইব্রাহীম (আঃ)-এর যুগে শিরক একটি দার্শনিক বিষয় হিসেবে রূপ পরিগ্রহ করে। আর তখন বুদ্ধির ওপরে দর্শনের বিজয় আরম্ভ হয়ে গিয়েছিলো। উহার সাথে তৌহীদ ও একত্ববাদের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পথগুলোও বের হয়ে আসছিলো যেগুলোর ওপরে আমল করা কেবল তৌহীদের মোটা মোটা বিষয়গুলোর ওপরে আমল করার শামিল আর ইহা খুবই কষ্টসাধ্য ছিলো। উহার দৃষ্টান্ত এমনই যে, যেভাবে মূর্তি পূজা আজও পৃথিবীতে মজুদ আছে। কিন্তু আজ যদি মূর্তি পূজকদেরকে বলা হয় যে, তোমরা কেন মূর্তি পূজা করো? তারা বলে যে, আমরা তো কোন মূর্তি পূজা করি না। আমরা তো কেবল নিজেদের ধ্যানকে কেন্দ্রীভূত করা জন্যে একটি মূর্তিকে সামনে রেখে নিই, যদিও শিরক তো উহাই যা পূর্বে ছিলো কিন্তু এখন শিরককে একটি নতুন রূপ দেয়া হয়েছে। এ ভাবেই ইব্রাহীম (আঃ)-এর যুগে শিরককে নতুন রূপ দেয়া হয়েছিলো। এই কারণেই ইবরাহীম (আঃ)-এর ব্যাপারে বারে বারে বলা হয়েছে যে, ওয়ামা কানা মিনাল মুশরিকীন – আর আমি মুশরেক ও অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই। আর নূহ (আঃ)-এর ব্যাপারে ইহা একবারও বলা হয়নি। কেননা, নূহ (আঃ)-এর যুগ পরিপূর্ণ শিরকের যুগ ছিলো না। লোকেরা কেবল নিম্নস্তরের শিরকে লিপ্ত ছিলো। যাথেকে রক্ষা করার জন্যে অধিক জ্ঞান-বুদ্ধির প্রয়োজন ছিলো না, আর মূর্তির সামনে ঝুঁকা এবং না ঝুঁকার বিষয়টি প্রত্যেক ব্যক্তি বুঝতে পারতো। কিন্তু ইব্রাহীমের সময়ে শিরক বাহ্যিক স্তর অতিক্রম করে অভ্যন্তরীণ রুসূম-রেওয়াজ পর্যন্ত পৌছে গিয়েছিলো। আর মূর্তির সামনে না ঝুঁকার দার্শনিক তত্ত্বের উন্নতির ও চিন্তা-শক্তির উন্নতির বুদ্ধি-ভিত্তিক অংশীবাদিতার আর এক ধরন সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিলো। এর মূলোৎপাটন করেন হযরত ইব্রাহীম আলায়হেস সালাম।

(চলবে)

অনুবাদ : মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

খতমে নবুওয়ত ও আহমদীয়া জামাত

মূল ঃ আল্লামা কাযী মুহাম্মদ নাযীর, লায়েলপুরী

(ষষ্ঠ কিস্তি)

পঞ্চম প্রশ্ন

কিন্তু যদি হযরত মসীহের (আঃ) ওফাত স্বীকারপূর্বক তাঁহার পুনরুজ্জীবিত হওয়াও ধরিয়া নেওয়া হয়, তবে ইহাতে আমাদের এই প্রশ্ন ঃ ঈসা আলায়হেস্ সালাম 'ইন্তেকাল' করিবার পর পুনরুজ্জীবিত হইয়া আগমন করিলে মওদুদী সাহেব ঐ সকল হাদীসের কী ব্যাখ্যা করিবেন, যেগুলি তিনি হযরত মসীহের আকাশ হইতে অবতরণের প্রমাণস্বরূপে তাঁহার পুস্তিকায় লিখিয়াছেন? যদি হযরত মসীহের আকাশ হইতে অবতরণের অর্থ তাঁহার পুনরুজ্জীবন হইতে পারে, তবে ইহার এই অর্থ হইতে পারে না কেন যে, এই সকল হাদীসের অর্থ কোন উম্মতি ব্যক্তি হযরত ঈসা আলায়হেস্ সালামের সদৃশ হইয়া আগমন করিবেন এবং তাঁহার সঙ্গে ঐশী সাহায্য থাকিবে। কারণ মৃত ব্যক্তির পুনরুজ্জীবিত হইয়া আসা, কুরআন করীম এবং আ হাদীসে নবুবি বর্ণিত কানুনের সম্পূর্ণ বিরোধী। কিন্তু আমাদের ব্যাখ্যা কুরআন করীমের কোন আয়াতের বিরোধী নয়।

আহ্‌মদীয়া সেল্‌সেলার প্রতিষ্ঠাতা বলেন ঃ

"স্মরণ রাখিতে হইবে, আমার এবং এই সকল লোকের মধ্যে এই এক বিষয় ব্যতীত আর কোন বিরোধ নাই। অর্থাৎ কুরআন ও হাদীসের স্পষ্ট উক্তিগুলি ছাড়িয়া ইহারা হযরত ঈসা আলায়হেস্ সালামের জীবিত থাকা বিশ্বাস করেন এবং আমি কুরআন ও হাদীসের উপরোক্ত স্পষ্ট উক্তি এবং অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন ইমামগণের 'এজমা' বা সর্ব-সম্মত মতানুসারে হযরত ঈসা আলায়হেস্ সালামের ওফাত স্বীকার করি এবং 'নযূলের' সেই অর্থই গ্রহণ করি, যাহা ইতোপূর্বে এলিয় নবীর পুনরাগমন ও নযূল সম্বন্ধে হযরত ঈসা আলায়হেস্ সালাম করিয়াছিলেন :

"তোমরা না জানিলে যাহাদের নিকট স্মারক-পুস্তক আছে, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর (সূরা নাহল, ৬ষ্ঠ রুকূ) আমরা কুরআন শরীফের স্পষ্ট উক্তি

"যাহাদের উপর মৃত্যু আসে, তাহাদিগকে রোধ করিয়া রাখেন" –এর উপর ঈমান রাখি। এই পৃথিবী হইতে যে সকল মানুষ মহাপ্রস্থান করে, তাহারা পৃথিবীতে পুনর্বসতি স্থাপনের জন্য প্রেরিত হয় না। এই জন্য খোদাও তাহাদের জন্য কুরআন শরীফে কোনই নিয়ম বিধিবদ্ধ করেন নাই যে, পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া তাহারা কীরূপে বন্টনকৃত মাল পাইবে ['আইয়ামুস্ সুলহ, ৮৮-৯৯ পৃঃ]?

মওদুদী সাহেব লিখিয়াছেন ঃ

" মোদ্দা-কথা হইল এই যে, যে ব্যক্তি হাদীসে বিশ্বাস রাখেন তাকে মান্‌তে হবে যে, আগামীতে সেই ঈসা ইব্‌নে মরিয়মই আগমন করবেন এবং তিনি পয়দা হবেন না বরং অবতীর্ণ হবেন"

['খত্‌মে-নবুয়াত' বাঙলা সংস্করণ, ৬৩-৬৪ পৃঃ]।

ষষ্ঠ প্রশ্ন

মওদুদী সাহেব হযরত ঈসা আলায়হেস্ সালাম ইন্তেকাল করিয়াছেন ধরিয়া নিয়াও তিনি পুনরুজ্জীবিত হইয়া আসিবেন বলিয়া স্বীকার করেন। সুতরাং, তাঁহার এই ব্যাখ্যা অনুসারে প্রতিশ্রুত মসীহের আগমন সংক্রান্ত হাদীসোক্ত 'নযূল' শব্দের অর্থ 'মৃত্যুর পর তাঁহার জীবন লাভ' হইতে পারে বলিয়া আমাদের প্রশ্ন হইল মসীহ মাওউদ মুহাম্মদীয় উম্মতের মধ্যেই 'পয়দা' হইবেন – এই ব্যাখাতে বাধা কি? বিশেষত:, কুরআন শরীফে খোদাতাআলা রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম 'পয়দা' হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার সম্মানার্থে 'নযূল' শব্দই ব্যবহার করিয়াছেন। যেমন, আল্লাহ্‌তাআলা বলেনঃ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌তাআলা তোমাদের নিকট একজন স্মরণদাতা রসূল 'নাযেল' করিয়াছেন যিনি তোমাদের নিকট আল্লাহ্‌তাআলার স্পষ্ট আয়াতগুলি পাঠ করিতেছেন"

[সূরা ত্বালাক্ব, রুকূ ২]।

আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের জন্য 'নযূল' শব্দ তাঁহার জন্মগ্রহণ সত্ত্বেও **ঐশী সাহায্যবশত: সম্মানার্থে যেমন ব্যবহৃত হইয়াছে,** তেমনি মসীহ্ মাওউদের জন্যও ঐশী সাহায্য প্রাপ্তিবশতঃ ব্যবহৃত হইয়াছে।

মসীহ্ মাওউদের আগমন সম্বন্ধে আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের হাদীসগুলির ভিত্তি হইতেছে 'কাশ্‌ফ-মুকাশাফাত'। এই কারণে ইহাদের সবগুলিরই ব্যাখার প্রয়োজন। আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওসাল্লাম 'মুহাম্মদী' উম্মতের মসীহ্‌কে 'ঈসা' কিংবা 'ইব্‌নে মরিয়ম' নামে অভিহিত করিবার উদ্দেশ্য ছিল হযরত ঈসা আলায়হে সালামের সহিত তাঁহার সাদৃশ্য সংকেত করা। এজন্য সহীহ্ মুস্‌লিমে তাঁহার জন্য বলা হইয়াছে, 'ফা আম্মাকুম মিনকুম'। বুখারী শরীফে বর্ণিত হইয়াছে, 'ওয়া ইমামুকুম মিনকুম' এবং মসনদে ইমাম আহ্‌মদ হাম্বলে 'মাহ্‌দিয়ান হাকামান আদলান' শব্দগুলি ব্যবহৃত হইয়াছে। অর্থাৎ, এই ইব্‌নে মরিয়ম তোমাদের মধ্যে হইতেই তোমাদের ইমাম হইবেন এবং তিনি 'ইমাম মাহ্‌দী' হইবেন। ইহা দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, 'ইব্‌নে মরিয়ম' বনী ইসরাঈলী মসীহ্ নহেন – বরং তিনি উম্মতে মুহাম্মাদীয়া'র ইমাম মাহ্‌দী, যিনি উম্মতী নবী হইবেন এবং খলীফা হওয়ার দরুন ইব্‌নে মরিয়মের সহিত সাদৃশ্য রাখিবেন। অতএব, ইমাম মাহ্‌দীকে **রূপকভাবে** 'ঈসা ইব্‌নে মরিয়ম' নাম দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং ইমাম মাহ্‌দীকেই – যিনি আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের খলীফা হওয়া স্বীকৃত – তাঁহাকে রূপকভাবে ঈসা ইব্‌নে মরিয়ম নাম দেওয়া হইয়াছে। সহীহ্ মুসলিমে বর্ণিত 'ফা আম্মাকুম মিনকুম' অর্থাৎ "ইব্‌নে মরিয়ম তোমাদের মধ্যে তোমাদের ইমাম হইবেন" সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত করিতেছে যে, 'ইব্‌নে মরিয়ম' দ্বারা ইস্রাঈলী মসীহ্‌কে বুঝায় না – মুহাম্মদী উম্মতের ইমাম মাহ্‌দীকে বুঝায়, যিনি আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওসাল্লামের পর এক উম্মতি নবী এবং খলীফারূপে হযরত মসীহ্ ইব্‌নে মরিয়মের 'মসীল' বা সদৃশ্যরূপে আগমন করিবেন। সুতরাং 'ইব্‌নে মরিয়ম' এবং 'ঈসা' নাম ইমাম মাহ্‌দীকে রূপকভাবে প্রদত্ত হইয়াছে।

অবশিষ্টাংশ ২০ পৃষ্ঠায়

আহমদীয়ত গ্রহণ – "হায়াতে কুদসীর" একটি পাতা

আমার বয়াত গ্রহণের পটভূমি

হায়াতে কুদসী থেকে হযরত মাওলানা গোলাম রসূল রাজেকী সাহেবের নিজ ভাষায় আহমদীয়ত গ্রহণের কাহিনী এখানে নিম্নে বর্ণনা করা হলো :

হযরত মাওলানা গোলাম রসূল রাজেকী সাহেব হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর প্রথম সারির সাহাবীদের মধ্যে একজন ছিলেন এবং আহমদীয়া সিলসিলার শীর্ষ স্থানীয় আলেম ও সাহেবে কাশ্‌ফ কেরামত বুযুর্গ ছিলেন। হযরত গোলাম রসূল রাজেকী সাহেব গুজরাট জেলার রাজেকী মৌজার অধিবাসী মিয়া করমেদীন সাহেবের সুযোগ্য সন্তান। ১৮৭৭ – কিম্বা ১৮৭৯ সালের মধ্যবর্তী সময় জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর দাদা পীর বখ্‌স (রহঃ) এলাকার একজন বড় বুযুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। হযরত মাওলানা গোলাম রসূল রাজেকী সাহেবের আহমদীয়ত গ্রহণ প্রসঙ্গে তার নিজ ভাষায় উল্লেখ করা হলো। তিনি বলেন ঃ আমি যখন মৌজা গুলকীতে মাওলানা রূমের মসনবী অধ্যায়ন করে ৪র্থ অধ্যায়ে পৌছি – সেই সময়ের কথা। একদিন যোহরের নামাযের পর আমি এবং মৌলভী ইমামুদ্দীন সাহেব কোন এক বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি, এমন সময় পুলিশের একজন সিপাই নামায পড়ার জন্য মসজিদে প্রবেশ করলেন। সাথে জিনিষ পত্রের সঙ্গে একটি পুস্তক বাঁধা ছিল। মৌলভী সাহেব পুস্তকটি পড়ার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করলে সিপাই তাঁকে পড়তে নিষেধ করলেন। মৌলভী সাহেব কারণ জিজ্ঞেস করলে সিপাই বললেন, এই পুস্তকটির প্রণেতা আমার একজন শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তি। হতে পারে এই পুস্তকটি দেখে আপনি মন্দ মন্তব্য করতে পারেন। তখন হয়ত আমার বরদাশ্‌ত না-ও হতে পারে। মৌলভী সাহেব আশ্বাস দিয়ে বললেন, আপনি নিশ্চিত থাকুন আমি আপনার গুরুজন সম্বন্ধে কোন খারাপ একটি কথাও বলব না। তখন সিপাই বললেন, যদি এমন হয়, তাহলে আপনি খুশীর সাথে পড়তে পারেন। এবং আপনার কাছে তিন চার দিন রাখতে পারেন। আমি এখন বিশেষ কর্ম নিয়ে মফ:স্বলে যাচ্ছি। ফেরার পথে পুস্তকটি নিয়ে যাবো। মৌলভী সাহেব পুস্তকটি সযত্নে রাখলেন এবং বাড়ী যাবার সময় সাথে করে বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। অন্য একদিন বিশেষ কোন এক কাজ উপলক্ষ্যে আমি মৌলভী ইমামুদ্দীন সাহেবের বাড়ীতে যাই এবং মৌলভী সাহেবের বৈঠক খানায় সেই পুস্তকটি দেখতে পাই। ঐ পুস্তক যা ছিল---- হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর রচিত পুস্তক 'আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম'। এর সাথে কতকগুলো (নযমের) কবিতার পাতাও রাখা ছিল। যখন আমি নযমের পাতাগুলো পড়তে শুরু করলাম, তার মধ্যে একটি নযম– আজিব নূরিস্ত দরজানে মুহাম্মদ (সাঃ)॥ আজিব লা লিস্ত দর কানে মুহাম্মদ (সাঃ)॥ আমি এই নযমের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পড়লাম। কিন্তু আমি আমার চোখের পানি রাখতে পারিনি। যখন শেষের লাইন পর্যন্ত পৌছি তখন দেখি লেখা রয়েছে– কেরামত গারচে বেনাম নেশা আস্ত রিয়া বাংগারজ গেলমানে মুহাম্মদ (সাঃ)॥ তখন আমার অন্তরে উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হয়। আহা, এমন সাহেবে কেরামত বুযুর্গের সংস্পর্শে যদি আমার নসীব হতো? তারপর পাতা উল্টালাম, তখন হুযুর আকদস এর নযম (কবিতা) দেখলাম– হার তরফ ফিক্‌র কো দৌড়াকে থাকায়া হামনে কোই, দীনে- মুহাম্মদ ছা না পায়া হামনে, এ পর্যন্ত পড়ে আরো – দেখলাম কাফের ওয়া মুলহেদ ওয়া দাজ্জাল হামে কাহ্‌তে হ্যায়, নাম কিয়া কিয়া গমে রাখ্যা ইয়া হামনে॥ তখন ঐ সকল ব্যক্তিদের সম্পর্কে আমার মনে খুবই ক্ষোভের সৃষ্টি হলো, যারা হুযুর আকদস এর নাম মুলহেদ, দাজ্জাল ইত্যাদি রেখেছে। আমার মধ্যে সীমাহীন আক্ষেপ দেখা দিলো। এখন আমার অপেক্ষা শুধু মৌলভী ইমামুদ্দীন সাহেবের। কিছুক্ষণ পর অন্দর থেকে বৈঠক খানা আসার সঙ্গে সঙ্গে আমি মৌলভী সাহেবকে জিজ্ঞেস করলাম, এহেন পবিত্র বুযুর্গ কে? তিনি এমন উচ্চস্তরের লেখা লিখেছেন? তিনি কোন যমানার বুযুর্গ? মৌলভী সাহেব আমাকে বললেন, তিনি মৌলভী গোলাম আহমদ, যিনি মসীহ ও মাহদী হবার দাবী করছেন এবং গুরুদাস পুর জেলাধীন কাদিয়ানে আছেন তিনি। হুযূর সম্পর্কে সর্বপ্রথম আমার মুখ থেকে যে বাক্য বের হয়, তা এই :-

"পৃথিবীতে এই ব্যক্তির ন্যায় আশেকে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আর কেউ হয় নি"। তারপর হুযূরের লিখিত নযম (কবিতা) গুলো পড়তে লাগলাম। তখন এক পৃষ্ঠায় হুযূরের এই কবিতাটি আমার সামনে আসে :- চুঁ মেরা নূরে পিয়ে কওমে মসীহি দাদান্দ - মুছলেহাতরা ইবনে মরিয়ম নামে কাহাদান্দ.....

ইয়ে দুশাহেদাজ পিয়ে তাছদিকমান ইস্তাদান্দ ..

মূল তথ্য উদঘাটন ও বয়াত :

এসব উচ্চাংগের বাণীসমূহ পাঠ করতেই হুযূর আকদস এর দাবী ঈসাহিয়ত এবং মসীহিয়তের হাকীকত উপলব্ধি করতে পারলাম এবং ১৮৭৯ এর সেপ্টেম্বর – কিম্বা অক্টোবর মাসে বয়াতের জন্য চিঠি লিখলাম। অতএব হুযূর আকদসের পক্ষ থেকে মাওলানা আবদুল করীম সাহেবের একখানা চিঠি আমার হস্তগত হয়। ইহা বয়াত গ্রহণ প্রসঙ্গে লেখা আমার নামে প্রেরিত হয়।

যখন এই চিঠি মৌলভী ইমামউদ্দীন সাহেবকে দেখালাম, তিনি তখন আমাকে বললেন, বয়াত করতে আপনি খুব তাড়াতাড়ি করে ফেলেছেন। সম্ভব হলে আরো গবেষণা করে নিলে ভাল হতো। আমি বললাম, আমার তো গবেষণা হয়েই গেছে এবং খোদার ফযলে সিদ্ধান্তও ঠিক হয়ে গেছে। এ বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত। তারপর মৌলভী সাহেব আমার নামে কাদিয়ান থেকে সে কাগজাদি পাঠানো হয়েছিল এ সব তিনি পড়তে লাগলেন। এসব প্রেরিত পত্রাদি পাঠ করে তার মধ্যে কতটুকু প্রভাব ঘটলো, কি উপকার হলো তা জানি না। তবে আমি যেন এক অন্ধকার জগৎ থেকে বের হয়ে আলোর জগতে এসে পৌছলাম।

কাদিয়ানে দস্তি বয়াত ঃ

অবশেষে খোদাতাআলার ফযলে হুযূর আকদসের কিতাবাদি পড়ার সৌভাগ্য হয় এবং তিনি ১৮৯৯ সালে আমার সঙ্গে হুযূর আকদসের দস্তি বয়াতের জন্য কাদিয়ান যাত্রা করেন। যখন আমি

এবং মৌলভী ইমামুদ্দীন সাহেব পবিত্র কাদিয়ানে গিয়ে পৌছি – এবং বয়াতে মুবারকে যাবার জন্য ভিতরকার সিঁড়ি দিয়ে উপরে যাচ্ছি তখন আমি দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে হুযূরের নজরানা পেশ করার জন্য টাকা বের করে আলাদা করছি, ততক্ষণে মৌলভী সাহেব হুযূরের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও মুসাফাহা করছেন, এমন সময় হুযূর আকদস মৌলভী সাহেবকে বললেন,

উওহ্ লারকা জু আপকে পিছে আ রাহা থা উসকো বুলাও – অর্থাৎ যে ছেলেটি আপনার পেছনে আসতে ছিল তাকে ডাকুন। মৌলভী সাহেব তৎক্ষণাৎ নীচে সিঁড়িতে এসে আমাকে বললেন, হযরত সাহেব আপনাকে স্মরণ করছেন। এ কথা শুনা মাত্র আমি তাড়াতাড়ি হুযূরের খেদমতে উপস্থিত হলাম এবং মসীহের সাক্ষাতের সৌভাগ্য হলো। তখন আমার মধ্যে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, আমি স্থির থাকতে পারিনি। অজান্তে হঠাৎ হুযূরের কদম মোবারকের উপর আমি পড়ে যাই এবং আমার হিচ্‌কী উঠে যায়। দস্তে মসীহ আমার মাথায় ও পিঠে অর্থাৎ হুযূরের পবিত্র হস্ত আমার মাথায় ও পিঠে বুলাতে লাগলো। আমি একটু সুস্থির হলে পড়ে মাথা তুললাম। হুযূর আমার হাত ধরে উঠালেন।

মৌলভী ইমামুদ্দীন সাহেব এবং অন্যান্য সাহাবীদের উপস্থিতিতে আমি হুযূরের হাতে বয়াত গ্রহণ করি। এই পরিবেশে এমন এক আশ্চর্য ঘটনা আমার জীবনে প্রদর্শিত হয়। হুযূর আকদস আমাকে না দেখেই মৌলভী ইমামুদ্দীন সাহেবকে আমার কথা জিজ্ঞেস না করেই বললেন, যে ছেলেটি আপনার পেছনে আসছিল তাকে ডাকুন। সত্যি সত্যি এ বিষয়টি হুযূর আকদস সম্বন্ধে একটি নিদর্শন।

(হায়াতে কুদ্‌সী, প্রথম খণ্ড ১৮ – ২০ পৃ:)

(মাসিক আনসারুল্লাহ্, নভেম্বর, ১৯৯৫ সংখ্যা থেকে গৃহীত)

অনুবাদ : **শেখ হেলাল উদ্দীন আহমদ**

(১৮ পৃষ্ঠার পর)

কুরআন মজীদ অনুসারে কোন খলীফা বাহির হইতে আসিতে পারেন না ঃ

কুরআন করীমের স্পষ্ট সাক্ষ্য এই যে, আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের উম্মতে কোন খলীফা বাহির হইতে আসিতে পারেন না। যাঁহারা খলীফা হইবেন, তাঁহারা মুহাম্মদী উম্মতের পূর্বে যে সকল খলীফা হইয়াছেন, তাঁহাদের অনুরূপ হইবেন বা তাঁহাদের সহিত সাদৃশ্য রাখিবেন। সুতরাং আল্লাহ্‌তাআলা সূরা নূরে বলেন:

"আল্লাহ্‌তাআলা তোমাদের মধ্যে যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং সময় উপযোগী কাজ করিয়াছে তাহাদের সহিত অঙ্গীকার করিতেছেন যে, তাহাদিগকে নিশ্চয়ই পৃথিবীতে খলীফা করিবেন যেমন তাহাদের পূর্ববর্তীদিগকে খলীফা করিয়াছিলেন" [সূরা নূর, রুকূ ৭]।

এই আয়াত হইতে স্পষ্ট জানা যায় যে, মুহাম্মদী উম্মতের খলীফাগণ মুহাম্মদী উম্মত হইতেই হইবেন এবং পূর্ববর্তী খলীফাগণের অনুরূপ ও তাঁহাদের সদৃশ্য হইবেন। যেমন,

'তাহাদের পূর্ববর্তীদিগকে খলীফা করিবার ন্যায়'– কথাগুলি ইহাই প্রমাণ করে এবং ইহা প্রকাশ করে না যে, পূর্ববর্তী কোন নবী ও খলীফা হইয়া আসিবেন। এই আয়াতে মুহাম্মদী উম্মতের খলীফাগণকে **'উপমেয়'** এবং তাঁহাদের পূর্বে বনী ইস্রাঈলের যে সকল নবী হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে **'উপমান'** নির্দেশ করা হইয়াছে। কারণ তাঁহারা 'কুল্লামা হালাকা নাবীয়ুন্ খালাফাহু নাবীয়ুন্'

– হাদীস অনুযায়ী মুহাম্মদী উম্মতের পূর্বে ছিলেন। সুতরাং মুহাম্মদী উম্মতের খলীফাগণ বনী ইস্রাঈলের নবীগণের 'উপমেয়' হওয়া বশতঃ **তাঁহাদের অনুরূপ হইতে পারেন,** কিন্তু বনী ইস্রাঈলের নবীগণ সকলেই 'উপমান' হওয়া বশতঃ তাঁহাদের মধ্যে কোন নবীই আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের **পরে আগমনপূর্বক তাঁহার খলীফা হইতে পারেন না।** কারণ, 'উপমেয়' সর্বদাই 'উপমান' হইতে পৃথক। সুতরাং, এই আয়াতের আলোকে মুহাম্মদী উম্মতের 'ইমাম মাহ্‌দী' হযরত ঈসা আলায়হেস্ সালামের অনুরূপ (মসীল) হওয়ার কারণে 'ঈসা' বা 'ইব্‌নে মরিয়ম' নাম লাভ করিতে পারেন, কিন্তু ঈসা আলায়হেস্ সালাম মুহাম্মদী উম্মতে আসিয়া আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের খলীফা হইতে পারেন না। সুতরাং তাঁহার 'জীবিত থাকা' বা 'মৃত্যুর পর জীবিত' হইয়া আসার ধারণা সম্পূর্ণ অলীক। কারণ এই আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি মুহাম্মদী উম্মতে খলীফা হইয়া আসিতেই পারেন না বলিয়া তাঁহাকে জীবিত রাখার কোনই সার্থকতা নাই। (চলবে)

ভাষান্তর ঃ এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার (মরহুম)

আহমদীয়াতের বিরোধিতায় নেতৃত্বদানকারী, মিথ্যা অপবাদদানকারী ও কুৎসা রটনাকারী লোকদের বিরোধে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক নির্দেশিত নিম্নোক্ত দোয়াটি প্রত্যেক আহমদী অধিক সংখ্যায় রীতিমত পড়তে থাকুন ঃ

اللهم مزقهم كل ممزق و سحقهم تسحيقا

لعنة الله على الكاذبين

(আল্লাহুম্মা মায্‌যিকহুম কুল্লা মুমায্‌যাকিন ওয়া সাহ্‌হিক্‌হুম তাস্‌হীকা। লা'নাতুল্লাহি 'আলাল কাযিবীন)

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্ ! তুমি তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে খন্ড-বিখন্ড কর এবং তাহাদিগকে একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেল। মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত !

জুমুআর খুৎবা

রোযার কিছু তত্ত্ব-কথা

সৈয়্যদনা হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)
প্রদত্ত জুমুআর খুৎবা, ২৬শে ডিসেম্বর, ১৯৯৭ইং, মসজিদে ফযল, লণ্ডন।

তাশাহ্হুদ, তাআওউয এবং সূরা ফাতেহা পাঠের পর হুযূর (আইঃ) সূরা বাকারার ১৮৬ এবং ১৮৭ নং আয়াত তেলাওয়াত করেন–

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ
فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ
يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا
هَدٰىكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝ وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَاِنِّيْ قَرِيْبٌ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ
اِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِيْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِيْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ ۝

[অর্থাৎ, রমযান সে মাস যাতে কুরআন নাযেল করা হয়েছে, যা মানব জাতির জন্য হেদায়াতস্বরূপ এবং হেদায়াত ও ফুরকানের (হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকারীর) জন্য সুস্পষ্ট প্রমাণদিস্বরূপ। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে কেউ এ মাসকে পায় সে যেন এতে রোযা রাখে; কিন্তু যে রুগ্ন অথবা সফরে থাকে তাহলে অন্য দিনে গণনা পূর্ণ করতে হবে; আল্লাহ্ তোমাদের জন্য স্বাচ্ছন্দ্য চান এবং তোমাদের জন্য কাঠিন্য চান না এবং তোমরা যেন গণনা পূর্ণ কর এবং আল্লাহ্র মহিমা কীর্তন কর এ জন্য যে, তিনি তোমাদিগকে হেদায়াত দিয়েছেন এবং তোমরা যেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং যখন আমার বান্দাগণ আমার সম্পর্কে প্রশ্ন করে তখন (বল) নিশ্চয় আমি নিকটে আছি। আমি প্রার্থনাকারীর উত্তর দিই যখন সে আমার নিকটে প্রার্থনা করে। সুতরাং তারাও যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার উপর ঈমান আনে যাতে তারা সঠিক পথপ্রাপ্ত হয়।]

অত:পর হুযূর (আইঃ) বলেন, রমযানে প্রবেশের পূর্বে এটি আমাদের শেষ জুমুআ যা, রমযান ছাড়া আদায় হবে, ঐদিক থেকে এটি শেষ। পরবর্তী জুমুআগুলো ইনশাআল্লাহ্ রমযানে আসবে। সর্বদা যেভাবে আমার এই পদ্ধতি চলে আসছে যে, রমযান আসার পূর্ববর্তী জুমুআতে রমযান সম্পর্কেই কিছু কথা বর্ণনা করে থাকি। অনেক সময় এ পদ্ধতি রমযানের জুমুআসমূহ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। এগুলি এমন বিষয়াদি যা পুনঃ পুনঃ শোনা সত্ত্বেও বিস্মৃত হয়ে থাকে। "ফাযাক্কির ইন্না ফাআতিয্ যিক্রা"– আয়াতে, এ উপদেশ রয়েছে যে, জোরালোভাবে বারংবার নসিহত কর। কেননা, এমন নসিহত যা পুনঃ পুনঃ করা হয় তা বড়ই কল্যাণের কারণ হয়। যদিও আপনাদের মধ্য থেকে অনেকে এমন রয়েছেন যারা পূর্বেও এ বিষয় শুনেছেন। তথাপি এমন বড় সংখ্যা নবাগতদের রয়েছে যারা গত রমযানের পর জামাতে প্রবেশ করেছে, তাদের অধিকার রয়েছে যে, তাদের সম্মুখে এই কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি করা হয়। এমনিভাবে ছোটরাও বড় হচ্ছে তাদের গোটা পরিবার জুমুআতে আসতে পারে না অথবা গত রমযানে ডিশ এন্টিনার প্রোগ্রাম এত ব্যাপকতর ছিল না যা এখন হয়েছে। এ সমস্ত বিষয় এ রকম যদি আপনি মনে করেন যে, আপনি জানেন তবুও নিশ্চিত থাকুন। কেননা, অধিকাংশ এমন রয়েছে যাদের প্রয়োজন আছে। তারা যদি মনে করেন তারা জানেন বা তাদের পূর্ণভাবে ধারণা আছে। কিন্তু যখন বিষয়টি আরম্ভ হবে তখন বুঝতে পারবেন হৃদয়ের গভীরে পৌছার জন্য এ শিক্ষার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন রয়েছে। "শাহ্রু রমাযানাল্লাযি উনযিলা ফিহিল্ কুরআন" রমযানের মাস "উনযিলা ফিহিল্ কুরআন" এর একটি অনুবাদ, যাতে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে 'হুদাল্লিন্নাস' মানুষের জন্য হেদায়াত রয়েছে "ওয়া বাইয়্যেনাতিন মিনাল হুদা" এমন সুপ্রকাশিত হেদায়াত যা সুস্পষ্ট। 'ওয়াল ফুরকান' এবং ফুরকান অর্থাৎ – নিজের ভিতর সুস্পষ্ট প্রমাণাদিও বহন করে। এই আয়াতের প্রথম অর্থ হল "শাহ্রু রমাযান্নাল্লাযি উনযিলা ফিহিল্ কুরআন" অর্থাৎ রমযানের মাস হচ্ছে সেই মাস যার মধ্যে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে।

প্রথম অনুবাদের যতটুকু সম্পর্ক রয়েছে যা সাধারণভাবে মুফাস্সিরগণ বর্ণনা করে থাকেন, রমযানে কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে – এর অর্থ হচ্ছে যে, রমযানে সম্পূর্ণ কুরআন অবতীর্ণ করা হয়। এটি ঠিক নয়। কেননা, কুরআনে করীম ধীরে ধীরে নাযিল হয়েছে। কেবল ঐ রমযান যাতে সম্পূর্ণভাবে নাযিল করা হয়ে গিয়েছিলো, তা ব্যতিরেকে সমস্ত কুরআন পুনরাবৃত্তি সম্ভব নয়।

দ্বিতীয়তঃ রমযান অনেক পরে ফরয হয়েছে, কিন্তু কুরআন নবুওয়তের প্রথম দিন থেকেই অবতীর্ণ শুরু হয়েছিল। তাহলে রমযানের সঙ্গে এর (কুরআনের) সম্পর্ক কী ? এ জন্য এ দৃষ্টিকোণ থেকে এটি বলা ঠিক নয় যে, রমযানেই ইহা অবতীর্ণ করা হয়েছে। রমযানে অজস্র ধারায় যা অবতীর্ণ হয়েছিল তা পুনরাবৃত্তি করা হত। উন্যিলা ফিহিল্ কুরআন – আয়াতাংশের এটি একটি অর্থ নেয়া যেতে পারে, যা সঠিক। সেই রমযানে "উনযিলা ফিহিল কুরআন"-এরপর যতটুকু অংশ নাযেল হয়েছিল, যদি দশ বৎসর পূর্বেও নাযেল হয়ে থাকত তথাপি অবশ্যই তা পুনারাবৃত্তি করা হত।

"উনযিলা ফিহিল্ কুরআন"-এর একটি অর্থ; কুরআনের অর্থকে শক্তিশালী এবং মজবুত করার জন্য আঁ হযরত (সাঃ)-এর উপর প্রত্যেক রমযানে নাযেলকৃত কুরআন পুনরাবৃত্তি করা হত।

দ্বিতীয় অর্থ এটি যা আমি অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে করেছি। "শাহ্রু রমাযানাল্লাযি উনযিলা ফিহিল্ কুরআন" রমযানের মাস সেটি, যার সম্পর্কে কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে। এই অর্থটি অত্যন্ত ব্যাপক। এর অর্থ হচ্ছে, এই কুরআন করীমে যত শিক্ষা রয়েছে তা রমযানে সকল মানুষের জন্য পালনযোগ্য হয়ে যায়। অথচ সাধারণ মাসে ঐ শিক্ষাসমূহের পালন করা আবশ্যক নয়। পালনযোগ্য এ অর্থে হতে পারে যে, মানুষ ইচ্ছা করলে পালন করতে পারে তবে সাধারণতঃ পালন করা জরুরী হয় না। রমযান মাসে কুরআন করীমের শিক্ষার এমন কোন অংশ নেই যা এই মাসে কার্যকরী হয় না। "উন্যিলা ফিহিল্ কুরআন" – এত মহান মাস যে, কুরআন এই মাসের জন্যই অবতীর্ণ হয়েছে।

এখন দেখুন রোযা একটি গুরুত্বপূর্ণ কুরবানী। অনেক মুফাস্সির লিখেছেন যে, "ওয়াস্তাঈনু বিস্সাবরে ওয়াস্ সালাত" এর মধ্যে 'সবরের' অর্থ হচ্ছে রোযা। রোযা এবং ইবাদতের জন্য সাহায্য প্রার্থনা কর। কিন্তু কতকজন রয়েছেন, যারা সারা বৎসর রোযা রাখেন। অথবা সারা বৎসরের কোন মাসে কোন রোযা রেখেছেন।

মুসলমানদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ এমন সব রয়েছেন যারা রোযা রাখেন না। দৈবক্রমে কোন বিপদ এসে পড়লে কেউ কোন রোযা রেখেও ফেলেন। অনেক কম সংখ্যায় এমন আছেন যারা রমযান ছাড়াও রীতিমত রোযা রেখে থাকেন। এমতাবস্থায় "উনযিলা ফিহিল কুরআন –"এর দ্বিতীয় অর্থ হবে – এটি সেই মাস যখন সমস্ত মুসলমানরাও রোযা রাখেন। পৃথিবীতে এমন মুসলমান নেই যে, রমযানে রোযা রাখেন না, যারা নামাযও পড়েন না তারাও মনে করেন রোযা আমাদের ক্ষমার কারণ হবে। রোযার উপর এত জোর দেওয়া হয় যে, যারা কিছুই করে না তারা অন্ত:ত রমযানের শেষ দশ দিনের রোযা রাখতে আরম্ভ করে দেন। তারা মদ পান করেন, প্রত্যেক ধরনের মন্দ জিনিষ খেয়ে থাকেন তারা মনে করেন রমযানের রোযা এগুলোর ক্ষমার কারণ হবে।

সুতরাং "উনযিলা ফিহিল্ কুরআন"এর অর্থ ঐটিই যে, এ রোযার মাসে কুরআনের সমস্ত শিক্ষার উপর শক্তিশালী ও কার্যকরীভাবে আমল করা হয়ে থাকে। এমন মনে হয় যেন, কুরআনের উদ্দেশ্যই ছিল এই মাসের বৈশিষ্ট্য এবং সৌন্দর্যাবলী বর্ণনা করা।

সুতরাং এ দৃষ্টিকোণ থেকে "উনযিলা ফিহিল্ কুরআন" এর কারণে আমাদের চিন্তা করা প্রয়োজন যে, এথেকে কী কী শিক্ষা অর্জন সম্ভব হবে।

প্রথমে কথা হচ্ছে যে, যদি "উনযিলা ফিহিল্ কুরআন" এর কথা সঠিক হয়ে থাকে তবে, "হুদাল্লিন্নাস" এ মাস এবং কুরআনে করীম, এ দু'টি মানুষের জন্য হেদায়াতস্বরূপ পাঠানো হয়েছে। এ মাস অতিক্রম করার পর এবং কুরআনে করীমের রাস্তায় শিক্ষা অর্জন করার পর "হুদাল্লিন্নাস" মানুষের জন্য হেদায়াত হবে। যদি কেউ রমযানের মধ্যে দিয়ে অতিক্রম করে আর হেদায়াত না পায়, তাহলে কি সে সত্যবাদী হবে, না কুরআন ? তার এ সমস্ত কথা বলা ভুল প্রমাণিত হবে যে, "আমি রমযানের রোযা পেয়েছি এবং আমি রমযান থেকে নিজের পাপ ক্ষমা করিয়ে নিয়েছি।" রমযানুল মুবারকে তার জন্য, কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমেই হোক বা সরাসরি রোযার মাধ্যমেই হোক কিছু না কিছু হেদায়াতের ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক। উভয় ক্ষেত্রে হেদায়াত পাওয়া আবশ্যক। "ওয়া বাইয়্যেনাতিম মিনাল হুদা" – এবং ঐ সমস্ত ব্যক্তি যারা পূর্ব থেকেই হেদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাদের জন্য "বাইয়্যেনাতিম মিনাল হুদা" – বাক্যে শুভ সংবাদ রয়েছে। রমযানে এত মহান হেদায়াত লাভ করবে যে, তাদের চক্ষু উন্মোচিত হয়ে যাবে। প্রথমে যার দিকে দৃষ্টিই ছিল না। ঐ "বাইয়্যেনাত" যাতে চক্ষু প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠে, সাময়িকভাবে এত আলোকিত হয় যে, মানুষ আশ্চর্য হয়ে দেখে যে, এটিও ছিল ! এ মাসে মানুষ এমন সমুজ্জ্বল হেদায়াত লাভ করে যা কুরআনে পূর্বেই বিদ্যমান ছিল।

"বাইয়্যেনাতিম্ মিনাল্ হুদা"র মধ্যে কুরআনের দিকে ইংগিত রয়েছে যে, এতে (কুরআনের হেদায়াত) বিদ্যমান আছে। কিন্তু এ হেদায়াতগুলোর জন্য চক্ষু উন্মোচিত হত না। এটি বাস্তব কথা যে, **প্রত্যেক রমযানে মানুষের চক্ষু উন্মোচিত হওয়ার সময় এভাবেই এসে থাকে। সারা জীবন যারা এটি মনে করে যে, আমরা সব কিছু পেয়ে গেছি, রমযানে এরূপ মনে হয় যে, এ আয়াত এখনই নাযিল হয়েছে, এখন এ আয়াতের বিষয়-বস্তু বুঝেছি।** এখন সেগুলো বাইয়্যেনাতের অন্তর্ভুক্ত হয়। "ওয়াল ফুরকান" – মানুষকে সুনির্দিষ্ট দলিলসমূহ দান করা হয়। এক দৃষ্টিকোণ থেকে ফুরকান –এর অর্থ হচ্ছে মানুষের এ সন্দেহ যে, "জানিনা আমি হেদায়াতের উপর আমল করছি কি না ?" ফুরকানে প্রবেশ করে সে আল্লাহ্তাআলার পক্ষ থেকে এমন দলিল পায় যে, সে বুঝে যায় বাস্তবে আমি সব কিছু পেয়ে গিয়েছি। অন্যদের উপর থেকে আলাদা করা হয়। কুরআন যেভাবে ফুরকান এবং অন্য সব ধর্মীয় কিতাব থেকে সুস্পষ্ট তেমনিভাবে মানুষ ও তার সত্তায় একটি ফুরকান হয়ে যায়। যখন সে আল্লাহ্তাআলার পক্ষ থেকে ফুরকান হয় তখন পৃথিবীর কোন শক্তি তার মোকাবেলা করতে পারে না। এ আয়াতের সঙ্গে আরো অনেক বিষয়াবলী রয়েছে কিন্তু সময়ের প্রেক্ষিতে আমি সংক্ষিপ্তভাবে সামনে অগ্রসর হব। কেননা, নবী করীম (সাঃ)-এর অনেকগুলো হাদীস আপনাদের সম্মুখে রাখতে হবে এবং তার ব্যাখ্যা দিতে হবে।

"ফামান্ শাহিদা মিন কুমুশ্শাহ্রা ফাল্ ইয়াসুম্হু" যে কেউ রমযানকে পায় "ফাল ইয়াসুম্হু" সুতরাং সে যেন এতে রোযা রাখে। 'শাহিদা' এর একটি অর্থ চাঁদের সাক্ষ্য অর্থাৎ রমযানের চাঁদ উঠলে মানুষ তা দেখে।

দ্বিতীয়ত: "শাহিদা মিন্ কুমুশ্শাহ্রা" – রমযানের তত্ত্বকে বুঝে এ মাসকে পেয়ে যায় এবং সে এটির উপর সাক্ষী হয়ে যায়, এমন ব্যক্তির জন্য আবশ্যক সে যেন রোযা রাখে। "ওয়া মান্ কানা মারিযান্ আও আলা সাফারিন্ ফাইদ্দাতুম মিন্ আইয়্যামিন্ উখর" যদি ঐ ব্যক্তি অসুস্থ হয় অথবা সফরের অবস্থায় থাকে 'ফাইদ্দাতুম মিন্ আইয়্যামিন্ উখর' তবে যেন অন্য দিনগুলোতে এ সংখ্যাকে পূণ করে। অনেক এমন ব্যক্তি আছে যারা সফরের অবস্থায়ও রোযা রাখে অথচ এ আয়াত পরিষ্কারভাবে বলছে যে, সফরের অবস্থায় রোযা রাখবে না। **মানুষ সফরের অবস্থায় জোরপূর্বক খোদাতাআলাকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করে, অথচ আল্লাহ্তাআলাকে জোরপূর্বক সন্তুষ্ট করা সম্ভব নয়। সারা জীবন রোযা রেখে মরে গেলেও জোরপূর্বক খোদাকে সন্তুষ্ট করা সম্ভব নয়। কেননা, তাঁর সন্তুষ্টির জন্য জগতে পুণ্য করা। উদ্দেশ্য যদি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি না হয় তবে এতে পুণ্য নেই। যদি তাঁর সন্তুষ্টি এতে থেকে থাকে যে, রোযা রেখো না তাহলে রাখবে না।**

আর এ কথা মনে করো না যে, তোমরা রমযানে সফরের অবস্থায় রোযা রেখে আল্লাহ্কে সন্তুষ্ট করতে পারবে। যদি আপনি সত্যিকার অর্থে ভাবেন তাহলে দেখবেন যে, রমযান মাসে সফরের অবস্থায় রোযা রাখা কোন পুণ্যই নয়। কেননা, মানুষ রমযান মাসে স্বাচ্ছন্দ্যে রোযা রাখে। ঐ রোযা যা রমযানের পর পৃথক রাখতে হয় তখন সে বুঝে, এটি কষ্টকর কাজ। অনেক মানুষ পুণ্যের উছিলায় সহজ পন্থা চায়। তারা ভাবেন রোযাকে কোন রকমে কাটিয়ে দাও; যতগুলো পারো রোযা কাটিয়ে দাও নতুবা পরে সমস্যা হবে। আলাহ্তাআলা মানুষের আত্মার অবস্থাকে জানেন, তার হৃদয়ের গভীরতা সম্পর্কে অবহিত। এজন্য আপনি আল্লাহ্তাআলাকে প্রতারিত করতে পারবেন না। আপনি পুনরায় নিজেকে বিশ্লেষণ করে দেখুন তাহলে আপনি দেখবেন অধিকাংশ সফরে রোযা পালনকারী এ জন্যই রোযা রাখে যে, এখন মাস অতিবাহিত হচ্ছে সবাই রোযা রেখে যাচ্ছে আমরাও সাথে সাথে রোযা রেখে নিই নইলে পরে কে রোযা রাখবে? আল্লাহ্তাআলা বলেছেন :-"আও আলা সাফারিন ফাইদ্দাতুম মিন আইয়্যামিন্ উখর" যদি সফরের অবস্থায় থাক তবে অন্য দিনগুলোতে রোযা রাখ। এখানে একটি চিত্তাকর্ষক কথা যা এর পরেই বলা হয়েছে "ইয়ুরীদুল্লাহু বিকুমুল্ ইউস্রা ওয়ালা ইয়ুরীদ বিকুমুল্ **'উসরা"**– আল্লাহ্ তোমাদের জন্য স্বাচ্ছন্দ্য চান আর তিনি তোমাদের জন্য কাঠিন্য চান না। এ কথাকে এখন ভাল করে বুঝে নিন তারপর ঐ ব্যক্তির দিকে ফেরত যান, যে এতে স্বাচ্ছন্দ্য চায়। তার কি অনুমতি হবে? তার অনুমতি হবে না। কেননা, তার রোযা

মোটেই রোযা নয়। আল্লাহ্‌তাআলা বলেন, স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে রোযা রাখ। স্বাচ্ছন্দ্য হবে এমন যাতে সমস্ত মন এবং হৃদয় পূর্ণভাবে রোযাতে থাকবে, এ অনুকুল পরিবেশে রোযা রাখ; কষ্ট করে অসুবিধায় নিপতিত হয়ে রোযা রাখবে না। সুতরাং ঐ ব্যক্তি যে (প্রকৃত উদ্দেশ্যকে এড়িয়ে) নিজ রোযাকে পূর্ণ করে সে বাস্তবে কাঠিন্যের রোযা রাখে। আল্লাহ্‌তাআলা বলছেন যে, "তিনি তোমাদের জন্য কাঠিন্য চান না, তোমাদের স্বাচ্ছন্দের সাথে রোযা রাখা উচিত" "ওয়ালিতুকমিলুল্ ইদ্দাতা"– পরে রোযা রাখা এজন্য যে, তোমরা গণনাকে পূর্ণ কর। ত্রিশ দিনের রোযা হলে ত্রিশ দিনের, উনত্রিশ দিনের রোযা হলে উনত্রিশ দিনের গণনাকে পূর্ণ করতে হবে। গণনাকে পূর্ণ করাই হলো আসল উদ্দেশ্য। সুতরাং রমযানকে দেখলে রমযানে রোযা না রাখার কোন অজুহাত গ্রহণীয় হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত এ রোযা পরবর্তীতে পালন না করা হয়। এর ফলশ্রুতিতে "ওয়ালি তুকাব্বিরুল্লাহা 'আলা মা হাদাকুম ওয়ালা'আল্লাকুম তাশ্‌কুরূন" যেন তোমরা আল্লাহ্‌তাআলার মহিমা কীর্তন কর। আল্লাহ্‌তাআলার মাহাত্ম্য বর্ণনা কর, "আলা মা হাদাকুম" এ জন্য যে, আল্লাহতাআলা তোমাদেরকে হেদায়াত দিয়েছেন, যে হেদায়াতের বর্ণনা পূর্বে এসে গিয়েছে। "ওয়ালা'আল্লাকুম তাশকুরূন" তাতে যেন তোমরা কৃতজ্ঞ বান্দায় পরিণত হও; তাঁর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর। **রমযানের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হওয়ার পর বাস্তবিক পক্ষে যদি আপনি সঠিক রোযা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে রেখে থাকেন তাহলে অবশ্যই রোযার পর অনেক কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সৌভাগ্য লাভ করবেন।** কেউ কেউ এ জন্য, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন যে, রমযান তাদের জন্য ভারী ছিল। তবে আল্লাহ্‌তাআলার অনুগ্রহ ভারী হওয়া সত্ত্বেও তারা রমযানের রোযা রেখেছেন। কেউ কেউ এ জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন যে, "মা হাদাকুম", রমযানে তারা অনেকগুলো হেদায়াত দেখেছেন, অনেকগুলি রমযান তাদের জন্য নিত্য নতুন হেদায়াত নিয়ে উদিত হয়েছে এবং ঐ ভাবেই বিদায় নিয়েছে। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সময় রমযানেই আসে আর তখনই কাজ হয়। কিন্তু রমযানের পরে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এই অর্থ বহন করে যে, তিনি মানুষের জন্য রমযানকে সহজ করে দিয়েছেন কঠিন হতে দেননি, তিনি স্বাচ্ছন্দ্য দান করেছেন তাঁর স্মরণের জন্য রাত্রিতে উঠে ক্ষুৎ-পিপাসাসহ প্রত্যেক ধরনের শারীরিক কষ্ট সহ্য করে, ফলশ্রুতিতে তিনি আমাদেরকে হেদায়াত দান করেছেন। সে হেদায়াত যা সাধারণ দিনে পাওয়া যায় না। সুতরাং এই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন সফলতার সঙ্গে রমযান অতিবাহিত হওয়ার কৃতজ্ঞতা। "লা'আল্লাকুম তাশ্‌কুরূন" এর সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য এবং সবচেয়ে বড় ফল, তা হ'ল আল্লাহ্‌কে লাভ করা। এরূপে এর তাৎক্ষণিক পরে আল্লাহ্‌তাআলা বলছেন, "ওয়া ইযা সায়ালাকা ইবাদি আন্নি ফাইন্নি কারীব" – আঁ হযরত (সাঃ)- কে সম্বোধনপূর্বক বলেন, হে রসূল! এখানে যদিও রসূলের নাম নেই তথাপি সম্বোধিত আঁ হযরত (সাঃ)-ই। "ইযা সাআলাকা ইবাদি 'আন্নি" আমার সম্পর্কে "ফাইন্নি কারীব" নিশ্চয় আমি নিকটেই রয়েছি। এ দোয়াতে জাগতিক প্রয়োজনাদি পূর্ণ করার কোন উদ্ধৃতি নেই। "ইযা সায়ালাকা ইবাদি আন্নি" অর্থাৎ যখন আমার বান্দাগণ আমার সন্ধান করে, আমাকে চায় এবং তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, 'আমরা কীভাবে আমাদের প্রতিপালককে পাব' তখন এটি বলেন নি যে, "কুল ইন্নি কারীব" তুমি তাদেরকে বলে দাও (আমি নিকটে রয়েছি) বরং বলেছেন "ইন্নী কারীব " আল্লাহ্ নিকটেই রয়েছেন, অথবা আমি নিকটেই রয়েছি। তৎক্ষণাৎ জবাবে "ফাইন্নী কারীব" নিকটে অবস্থানকারী কোন সময় অন্যের উদ্ধৃতি দেয় না, অন্য কাউকে বলে না যে, তাকে বলে দাও আমি নিকটে আছি। এতে প্রশ্নকারীর নিয়্যতে আন্তরিকতার বর্ণনা রয়েছে। যদি প্রকৃত পক্ষে কেউ আল্লাহ্‌কে চায়, হে রসূল! যখনই সে আমাকে জিজ্ঞেস করে (তাহলে তুমি তাকে বলে দাও) আমি তার ডাক শুনছি। আমাকে এ কথা বলার জন্য সেই সময় তোমার বরাতের প্রয়োজন নেই। "ইন্নি কারীব" আমিও সম্মুখেই দাঁড়িয়ে আছি, জীবন শিরা থেকে নিকটে। তবে "উজিবুদাওয়াতাদ্ দায়ে ইযা দা'আনি" – আমি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনাকে শুনে থাকি যখন সে আমাকে ডাকে, অর্থাৎ – আমার ব্যাপারে আকাঙ্খা রাখে। জাগতিক তাড়নার কারণে যেন আমাকে স্মরণ না করে। এটি অদ্ভুত দৃশ্য অঙ্কণ করা হয়েছে, যা রমযানে আপনি বেশী দেখার সুযোগ পাবেন। অত্যন্ত সুন্দর দৃশ্য, কতক লোক রয়েছে যারা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছে জঙ্গলে আল্লাহ্ আল্লাহ্ করে, চিৎকার করে আল্লাহ্‌কে খুঁজে বেড়াচ্ছে তথাপি তাদের আল্লাহ্ লাভ হয় না। কতক লোক এমন আছে যারা আবেগে আপ্লুত হয়ে "আল্লাহ্" বলে ডাকে যাতে তারা আল্লাহ্‌কে লাভ করে। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কী? সে পার্থক্য এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে। "ফাল্ ইয়াস্‌তাজিবু লী" এই প্রার্থনাকারীদের অবশ্য কর্তব্য যে, তারা আমার কথাও মানবে। আমাকে যেন এভাবে না ডাকে যেভাবে চাকরদেরকে ডাকা হয়। যখন প্রয়োজন পড়ে আর ডাক দেয় তখনই সে উপস্থিত হয়ে যায়। **এমন বান্দা যারা আমার কথার দিকে দৃষ্টি দেয় এবং আমার কথার উপর আমল করে তারা প্রথমে আমার বান্দাতে রূপান্তরিত হয়, এরপর যখন তারা ডাকবে তখন তাদের আর জঙ্গলে যাওয়ার প্রয়োজন হবে না। যেখানেই তারা আমাকে ডাকবে সেখানেই আমি তাদের সঙ্গে থাকব।** ঐ সমস্ত ব্যক্তি যারা পার্থক্য করতে পারে না, অনেক সময় তারা এ প্রশ্ন উপস্থাপন করে যে, আমরা আল্লাহ্‌কে চর্তুদিকে অনেক ডেকেছি কোথাও আমরা খোদার চিহ্ন দেখতে পাইনি। তাদের মধ্যে বড় বড় কবি রয়েছেন যারা এ কথার দাবী উপস্থাপন করেন যে, আমরা আল্লাহ্‌কে অনেক ডেকে দেখেছি কোথাও কোন চিহ্ন পাইনি। তাদের মধ্যে এ যুগের নাস্তিকরাও রয়েছে যারা রকেটে ভ্রমণ করেছে তারা বলে, আমরা আল্লাহ্‌কে অনেক ডাক দিয়েছি কিন্তু কোথাও কোন চিহ্ন পাইনি। তাদের মধ্যে এ যুগের ফেরাউনরাও রয়েছে যারা সুউচ্চ অট্টালিকা জবর দখল করে তার চূড়ায় উঠে ঘোষণা দেয় আমাদের এখানে কোথাও কোন খোদা দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু "ফাল্‌ইয়াস্‌-তাজিবু লী" এর শর্ত পূর্ণ করেনি তাদের জীবন খোদাতাআলার উদ্দেশ্যে হয় না। এই সমস্ত ব্যক্তি দুশ্চরিত্রের অধিকারী হয়ে থাকেন। তারা আল্লাহ্‌তাআলার বান্দাদের সাথে সে ব্যবহার করেন না, যা আল্লাহ্‌তাআলা নিজ বান্দাদের সাথে করে থাকেন। সুতরাং তারা যখন এ শর্ত পূরণ করে না তখন তাদের ডাকার দাবী মিথ্যা। তারা ডাকতে থাকুক, তাদের ডাক "সাদাবা সেহরা" (এমন মরুভূমি যেখানে ডাক প্রতিধ্বনিত হয় না) প্রমাণিত হবে। মরুভূমিতে ডাক দিলে তার প্রতিধ্বনি উচ্চারিত হয় না। একদিক থেকে বেরুলে ছড়িয়ে যেতেই থাকে। নিকটে কোথাও কোন টিলা থাকলে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসে নতুবা "সাদাবা সেহরা" অর্থ হচ্ছে এমন মরুভূমি যাতে প্রতিধ্বনি সৃষ্টি হয় না। সুতরাং তারা এমন ব্যক্তি হবে যারা আমাকে ডাকবে কিন্তু আমার কোন চিহ্নই পাবে না। "ফালাইয়াস্‌তাজিবু লী ওয়াল ইউ'মেনুবি" – প্রথমে আমার ডাকে সাড়া দেয়, অতঃপর আমার উপর ঈমান আনে। যারা আমার কথার জবাব দেয় আমি তাদের সম্মুখে অন্যভাবে প্রকাশিত হয়ে থাকি।

এইসব শর্ত সাপেক্ষে ঐ ঈমান হয় অত্যন্ত মজবুত। খোদা এমন লোকের সাথে সাথে থাকেন। তার ঈমানই আসল ঈমান। বাকী সমস্ত ঈমান দূরের কথা। "রমযানুল মুবারক" এর ৪টি বৈশিষ্ট্য যে, এর শেষে 'তাশ্‌কুরূন' এর কথা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, কেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে? ব্যাখ্যা হচ্ছে এই যে, প্রত্যেক রমযান তোমাদের সামনে খোদাতাআলাকে নিয়ে আসে। প্রত্যেক রমযানের ফল আল্লাহ্‌তাআলা তোমাদের আর কারো খুঁজে বেড়ানোর বা ডাক দেয়ার কোন প্রয়োজন নেই। আল্লাহ্‌কে যখন পাও তখন স্মরণ রাখবে "ফাইন্নি কারীব" আল্লাহ্‌তাআলা সাথেই আছেন।

হযরত আকদস মসীহ মাওউদ (আঃ)-এ বিষয়ে বিভিন্ন পুস্তকে, নিজের মালফুযাতের মজলিসসমূহে ব্যাপকভাবে আলোকপাত করেছেন। তিনি (আঃ) বলেছেন, স্মরণ রাখবে! বাস্তবে আল্লাহ্‌কে যদি একবার লাভ হয় তাহলে তিনি ছেড়ে যান না, বান্দা ছেড়ে চলে যায়, কিন্তু আল্লাহ্‌ ছাড়েন না। এটি খোদাতাআলার সিফাতে "ওফা" (বিশ্বস্ত)-এর একটি বৈশিষ্ট্য যা আমরা মানুষের মধ্যে দেখি না। এ বিষয়-বস্তুকে তিনি পদ্যে এবং গদ্যে বর্ণনা করেছেন। এত জোরালোভাবে বর্ণনা করেছেন যে, পরিষ্কার বুঝা যায় তিনিই (আঃ)-সেই ব্যক্তি যার সঙ্গে ঐ খোদাতাআলা রয়েছেন নতুবা এদিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হত না, ধারণাও জন্মাতো না। আল্লাহ্‌তাআলার বান্দারা ছাড়া যারা দুনিয়াতে খোদার বান্দা সেজে বসে আছে, তাদের লেখনি, বক্তৃতা শ্রবণ করুন যা ঐ সমস্ত বিষয় থেকে শূন্য। তাদের কোন অভিজ্ঞতাই নেই। মোল্লাতন্ত্রের কথাগুলো শুনে দেখুন, (মসীহ মাওউদ-আঃ-এর)-এ কথাগুলোর সঙ্গে কত পার্থক্য? "ওয়াল ইউ'মেনূবী" আমার হয়ে যাওয়ার পর আমার উপর ঈমান আনে, "লাআল্লাহুম ইয়ারশুদূন" যেন তারা সঠিক পথ পায় এই 'রুশদ' সেই চূড়ান্ত সঠিক পথ যার পর চতুর্দিকে কেবল আলো আর আলো দৃশ্যমান হয়। সুতরাং এটি হচ্ছে রমযান। যাতে আমরা অচিরেই প্রবেশ করতে যাচ্ছি। আমি আশা রাখি যারাই এ খুৎবাকে শ্রবণ করেছে, তারা রমযানে যাওয়ার পূর্বে পূর্ণ প্রস্তুতি নিবে। ঐ সমস্ত ব্যক্তি যারা ভয় করেন যে, রমযান কষ্টকর তাদের জন্য আমার বাণী – রোযা বাহ্যতঃ কষ্টকর মনে হয়; কিন্তু আমাদের সবার অভিজ্ঞতা রয়েছে যে, রমাযানে প্রবেশের পূর্বে কষ্টকর মনে হলেও আল্লাহ্‌তাআলা সেই কাঠিন্যকে স্বাচ্ছন্দ্যে পরিবর্তন করে দিয়ে থাকেন, আর এ প্রতিশ্রুতি বিশেষ করে স্মরণ রাখা দরকার যে, "ইউরীদুল্লাহু বিকুমুল ইউস্‌রা" – যে, আল্লাহ্‌তাআলা তোমাদের জন্য স্বাচ্ছন্দ্য চান সুতরাং আল্লাহ্‌তাআলা যদি স্বাচ্ছন্দ্য চান তবে তিনি আপনাদের জন্য আপনাদের রমযানকে সহজ করে দিবেন। দোয়া করলে এমনই হবে। এখন রোযা সম্পর্কে হযরত আকদস রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর কিছু উদ্ধৃতি আপনাদের সম্মুখে রাখছি।

[আমি কথা প্রসঙ্গে এটিও বলে দিতে চাই যে, আমি আজ প্রভাতের অনেক পূর্ব থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে পানি পান করিনি। কেননা, আমি দেখছিলাম যে, রমযানের সময় আমি যখন খুৎবা দিব তখন আমার মুখ কী পরিমাণ শুষ্ক থাকে আর কতটুকু অসুবিধা হয়, আমি তা আজ পরীক্ষা করে দেখে নেই এ জন্য ভয় পাবেন না। কেউ কেউ এমন আছেন যে, আমার প্রত্যেক ব্যাপারে ভয় পেয়ে যান, ভয়ের কোন কারণ নেই। আমি মনে করছি এটি একটি পরীক্ষা। ঠিকই যাচ্ছে। রমযানে এমনই মুখ শুষ্ক থাকবে আর খুৎবা হবে আর্দ্র। চেহারা শুষ্ক কিন্তু চক্ষু সিক্ত থাকবে। আমাকে বারংবার বলতে হয়। কেননা, মানুষের এটি অভ্যাস হয়ে গিয়েছে যে, তারা আমার অনেক ঘনিষ্ঠ বলে দেখাতে চায়। তৎক্ষণাৎ ফোন ও তার আসতে আরম্ভ করে যে, আপনার মুখ শুষ্ক হয়ে গিয়েছিল, আপনার মুখ শুষ্ক হয়ে গিয়েছিল। তাঁদের এতটুকু জ্ঞান নেই যে, হযরত মুসলেহ্‌ মাওউদ (রাঃ)-এর সারা জীবনে প্রত্যেক খুৎবাতে এবং অনুষ্ঠানে পাঁচ মিনিট পর পর চায়ের কাপ পেশ করা হত। তাদের অসুবিধা কি? তাঁরা মনে করেন যে, এ বিপদ শুধু আমার উপর পতিত হয়েছে। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ)-এর কোন একটি খুৎবা বা জলসার বক্তৃতার কথা আমার স্মরণ নেই যে, যখন তাঁর নিকট চায়ের কাপ পেশ করা হয়নি। আমার স্মরণ আছে যে, আমিও নিকটে নীচে বসে থাকতাম সেই তবারকের জন্য যা কাপে উচ্ছিষ্ট থাকত। আর সবাই ঐ তবারকের জন্য এক সঙ্গে হাত বাড়াতেন। চা হত অত্যন্ত সু-স্বাদু। খোদাতাআলা ভাল জানেন যে, ঐ সময় তবারকের বেশী সখ ছিল, না চায়ের। তবে আমরা চা পাওয়ার জন্য নিকটে গিয়ে সেখানে বসতাম।

খান সাহেব, যিনি হযরত সাহেবের জন্য উপরে চা রাখতেন, কখনো কখনো তিনি আমাদের দিকে হাত বাড়িয়ে বলতেন, নাও এটি তোমার চা, নাও এটি তোমার চা। হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস্‌ (রাহঃ)-এর যুগ আপনাদের মধ্য থেকে অধিকাংশই দেখেছেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌ (রাহঃ) কি বারবার "কাহ্‌ওয়া" (green tea) পান করতেন না? আমি যা পান করছি তার চেয়ে অনেক বেশী পান করতেন। ঐ "কাহ্‌ওয়া" এর উপর তাদের কখনো কোন আপত্তি উত্থাপিত হয়নি। আর এখন আমার গরম পানির উপর আপত্তি হচ্ছে। বড় অদ্ভূত সহানুভূতিকারী। তাদের চিন্তা করা উচিত, বুঝা উচিত যে, এ পদ্ধতি আজ থেকে শুরু হয়নি। খেলাফতের যুগের কথা যখন থেকে আমার স্মরণ আছে, সে যুগ থেকে এখন পর্যন্ত ঐ অবস্থায় আছে। আল্লাহ্‌তাআলার যদি এতে সন্তুষ্টি থেকে থাকে যে, বক্তৃতার মাঝে এক চুমুক পানি পান করে নিব এতে আপনার আপত্তি কি? তবে এখন আমি চেষ্টা করছি পান না করার এবং এমন পদ্ধতি অবলম্বন করার চেষ্টা করছি যাতে মানুষ রেহাই পায়। এতে আমার কোন অসুবিধা হবে না। যাদের অবলোকন করা পীড়াদায়ক হয় তারা যেন রেহাই পায়। কথা প্রসঙ্গে এটি বর্ণনা করার পর এখন আমি হাদীসে নববীর দিকে আসছি]।

হুযূরে আকরম (সাঃ)-বলেন, "আস্‌সিয়ামু যুন্নাতুন ওয়া হিস্‌নুন হাসীনুন মিনান্‌নার" উদ্ধৃতিটি মুসনাদ আহমদ থেকে নেয়া হয়েছে। আঁ হযরত (সাঃ) বলেন রমযান ঢালস্বরূপ। ঢাল এ জন্য সম্মুখে রাখা হয় যেন তীরের দৃষ্টি না পড়ে। রমযান তোমাদের জন্য প্রত্যেক ধরনের মন্দের মোকাবেলায় ঢাল হিসাবে দান করা হয়েছে। শয়তান তীর নিক্ষেপ করবেই, বিভিন্ন কুমন্ত্রণা তোমাদের দিকে নিক্ষেপ করা হবে, কিন্তু রমযান কুমন্ত্রণা এবং মন্দ খেয়ালসমূহের জন্য ঢাল হয়ে যাবে। "হিস্‌নুন হাসীনুন মিনান্‌নার" আগুনের মোকাবেলায় এমন দূর্গ যা 'হিস্‌নে হাসীন' এমন দূর্গ যা অত্যন্ত মজবুত করে তৈরী করা হয়েছে, যেখানে পৌছা শত্রুর পক্ষে সম্ভব নয়। আল্লাহ্‌তাআলার ফযলে আমরা এখন এমন "হিস্‌নে হাসীনে" প্রবেশ করতে যাচ্ছি।

নেসাই কিতাবুস্‌ সওমের আর একটি উদ্ধৃতি এই যে, রোযা আগুন থেকে রক্ষাকারী ঢাল। মুতারেফ বর্ণনা করছে আমি ওসমান বিন আবি আস্‌ এর নিকট গেলে তিনি দুধ আনান। আমি বলি, আমি রোযা রেখেছি। ওসমান বলতে থাকেন, আমি রসূলে করীম (সাঃ)-কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, রোযা আগুন থেকে রক্ষাকারী ঢাল। ইতিপূর্বে যে ঢালের কথা হচ্ছিলো। আগুনে প্রবেশ করানোর জন্য আগুনের তীর আপনার দিকে নিক্ষেপ করা হয়, যদি আপনি তীরগুলি আপনার শরীর পর্যন্ত পৌছাতে দেন তাহলে এগুলি আগুন জ্বালানোর

কারণ হবে। রোযা এগুলো থেকে বাঁচানোর জন্য ঢালস্বরূপ। "যে-ভাবে যুদ্ধ থেকে বাঁচার জন্য তোমাদের কারো নিকট ঢাল থাকে" – এটি ঐ হাদীসের ব্যাখ্যা যা অন্য একটি হাদীসে পাওয়া যায়।

একটি চিত্তাকর্ষক হাদীস যাতে পুনরায় চিন্তা করার প্রয়োজন রয়েছে। হযরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করছেন যে, আঁ হযরত (সাঃ) বলেন, "ইন্নাফিল জান্নাতে গুরাফাল তারা জহুরুহা মিন বতুনেহা ওয়া বতুনুহা মিন জহুরেহা"। এ সমস্ত হাদীসটি জামে তিরমিযী কিতাবুল বিররে ওয়াস্‌সিলাহ্ থেকে নেয়া হয়েছে। হযরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, আঁ হযরত (সাঃ) বলেন, নিশ্চয় জান্নাতে 'বালাখানা' (সুরম্য উচ্চ প্রাসাদ) হবে যার ভিতর থেকে বাইর এবং বাইর থেকে ভিতরে দেখা যাবে, এই হাদীসের বিষয়-বস্তু বলছে যে, অবশ্যই এই হাদীসটি হযরত আকদস রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর বাণী নতুবা যেভাবে বিষয়-বস্তু সম্মুখে আসবে আপনি আশ্চর্য হবেন যে, কারো চিন্তা এবং মস্তিষ্কে ইহা আসতেই পারে না। সাধারণতঃ মানুষ নিজের ঘরের গোপনীয়তা চায়, যেন কোন অবস্থাতেই লোক তাকে বাইর থেকে যেন না দেখে। যদি এক দিক থেকে দর্শনযোগ্য কাঁচ যেমন কিনা আজকাল পাওয়া যায়। যা ভিতর থেকে বাইরে দেখা যায় কিন্তু বাইরে থেকে ভিতরে দেখা যায় না, এটি একটি প্রাকৃতিক আকাঙ্খা। আমরা এখন এমন এমন অনেক জাল (Net) এবং কাঁচ তৈরী হতে দেখছি যা মটর গাড়িতে এ জন্য লাগিয়ে দেয়া হয় যেন ভিতরের যাত্রী বাইরে অবলোকন করতে পারে এবং বাইরের লোক ভিতরে দেখতে না পারে। এটি ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের আবিষ্কার যারা পর্দা পালন করে না। মানুষের প্রকৃতি এটিই চায় যে, সে নিজে মানুষের দৃষ্টি থেকে সুরক্ষিত থাকুক এবং মানুষকে সে দেখুক। কিন্তু এ হাদীসে অদ্ভূত সংবাদ রয়েছে। হুযূর (সাঃ) বলেন যে, ভিতরের লোক বাইরের লোককে আর বাইরের লোক ভিতরের লোককে দেখবে। এটি বড় আশ্চর্যের কথা। সেই যুগে যদি ভিতরের লোক বাইরের লোককে দেখতে পারতো তবে আবশ্যক ছিল যে, বাইরের লোক ভিতরের লোককে দেখতে পারবে। কেননা, একদিকে দেখা যায় এমন কাঁচ সে যুগে আবিষ্কার হয়নি, বিশেষ করে সুরম্য প্রাসাদের (বালাখানা) এভাবে বর্ণনা দেওয়া সে যুগের কথা বলে মনে হয় না, এ যুগের কথা মনে হয়। যখন এমন কাঁচ আবিষ্কার হয়ে গিয়েছে যাতে একদিকে দেখা যায়। হযরত আলী (রাঃ)-এর রসূলুল্লাহ্‌র (সাঃ) দিকে নিজে হাদীসটি সম্বন্ধযুক্ত করার প্রয়োজন কী ছিল? সেই যুগের দৃষ্টিকোণ থেকে ইহা অদ্ভূত কথা। 'বালাখানা' (সুরম্য প্রাসাদ) হবে ভিতরের লোক বাইরে দেখবে আর বাইরের লোক ভিতরে দেখবে। এমন 'বালাখানা' যেন তা বাজারে পড়ে আছে, এর উপকারিতা কী? এরপর যে বিষয় রয়েছে সেটি বড় মজার যা এর উপর প্রজ্ঞাপূর্ণ আলো বিকিরণ করছে। এক গ্রাম্য ব্যক্তি (আরবী) দাঁড়িয়ে কথাগুলো শুনে হযরত (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, এমন 'বালাখানা' যাতে এই দিক থেকে দর্শনীয় হবে, তা কাদের জন্য হবে? হুযূর (সাঃ) বলেন, তাদের জন্য যারা সুমিষ্টভাষী, গরীবদের খাবার দানকারী, রোযা আদায়কারী এবং যখন রাতে সব লোক ঘুমন্ত অবস্থায় থাকে তখন নামায আদায়কারী। এ কথার সাথে ঐ কথার সঙ্গে কী সম্পর্ক? **মানুষের পুণ্যের কিছু দিক রয়েছে যা মানবজাতির কাছে উন্মুক্ত, মানবজাতি তাদের সেই দিকগুলো দেখতে পারে। একজন মানুষ কোন অভাবীর অভাব পূরণ করে যেভাবে এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। অভাবী তার অনুগ্রহকারীকে অনুগ্রহকারী আবার অভাবীর অভাবকে জানতে পারছে। এটি দু'দিকে দর্শনীয় বিষয়,** কিন্তু ঐ ব্যক্তি রাতে যখন সব লোক ঘুমন্ত অবস্থায় থাকে যখন সে উঠে দাঁড়ায় (ইবাদতের জন্য) তখন তাঁর এই পুণ্যকে কেউ জানতে পারছে না। কেউ জানে না যে, সে রাত কীভাবে কাটিয়েছে? কিন্ত আল্লাহ্‌তাআলার এটি মাহাত্ম্য যে, জান্নাতে তাদের অভ্যন্তরীণ পুণ্যকে দেখানো হবে। যেহেতু জান্নাতে প্রবেশকারী লোকদের এমন কোন বিষয় নেই যা দুনিয়ার দৃষ্টি বহির্ভূত রাখা হবে। সেখানে সবাই একে অন্যকে জানবে। সেখানে যা কিছু হবে সব পুণ্যের কথাই হবে, যা প্রকাশে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু দুনিয়াতে যে পুণ্য তারা গোপন করত আর তা অন্যদের দেখার সুযোগ দিত না, যা ছিল অত্যন্ত প্রিয়। আল্লাহ্‌তাআলার এটি একটি মহিমা। তিনি বলেন, আমি দেখাব। সবাই জেনে যাবে এরা সেইসব লোক যাদের গোপন কর্মের খবর আমরা জানতাম না যে, এভাবে তারা আল্লাহ্‌র ইবাদত করতেন এবং পুণ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। সুতরাং এটি আল্লাহ্‌তাআলার মাহাত্ম্য যে, হাদীসে নববী (সাঃ) সত্য হয়। ইহা নিজে কথা বলে। ইহা অসম্ভব যে, ইহা রসূল (সাঃ) ব্যাতিরেকে অন্য কারো কথা হবে। আমার কখনো প্রয়োজন পরে নি যে, আমি রাবী (হাদীস বর্ণনাকারী)-এর বরাতে হাদীসের সত্যতা নিরূপণ করি। আমি হাদীসের বরাতে হাদীসকে নিরূপণ করে থাকি। **নির্ভুল হাদীস নিজের ভিতর নিশ্চিত এত দলীল-প্রমাণ এবং সত্য মিথ্যার প্রভেদকারী বিষয়াদি বহন করে যে, এর নিরূপণের জন্য রাবীর বরাতের প্রয়োজন হয় না।**

আরও একটি কথা রমযান সম্পর্কে ইবনে মাজার হাদীসে আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, "প্রত্যেক জিনিসকে পবিত্র করার জন্য একটি যাকাত আছে।" অর্থাৎ যখন আপনারা আপনাদের প্রয়োজন থেকে কিছু না কিছু খোদাতাআলার জন্য বের করেন। দৃশ্যত: মনে হয় তখন এটি (সম্পদ) কমে যায়। কিন্তু **যাকাতের অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্‌তাআলার নিকট বেড়ে যায়। এর যাকাত হওয়ার প্রমাণ এই যে, যাকাত দাতা দুনিয়া এবং পরকালে উভয় জগতে বরকত ও কল্যাণ লাভ করে। বিনষ্ট হয় না।** হুযূর (সাঃ) বলেন, "প্রত্যেক জিনিসকে পবিত্র করার জন্য একটি যাকাত রয়েছে। শরীরের বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা রোযা।" আপনি যখন রোযা রাখেন তখন আপনার সত্তার প্রত্যেক অংশ থেকে আল্লাহ্‌র অংশ বের করে দেন। ক্ষুধা লাগে, পিপাসা পায়, অনেক সময় চিৎকার করার ইচ্ছা করে, অনেক সময় মানুষ বাজে কথা বলেই থাকে। যার অভ্যাস আছে সে বাজে চুটকি শুনানোর চেষ্টা করবে এবং কেউ রাগের সঙ্গে কথা বললে তাকে রাগের সঙ্গে জবাব দেয়ার ইচ্ছা করবে। প্রত্যেক ক্ষেত্রে প্রত্যেক মানবীয় আকাঙ্খায় শিকল পড়ানো হয়েছে। তার আশার উপর রশি বাঁধা হয়েছে। এমন ব্যক্তি আল্লাহ্‌তালার আদেশের নিয়ন্ত্রণে, তা ছেড়ে এদিক সেদিক যেতে পারে না। এটিই হচ্ছে তার যাকাত। এ যাকাতের অপর একটি অর্থ হচ্ছে, রমযান যখন চলে যাবে তখন তার ভিতর ভাল বিষয়াদি ছিল তা বেড়ে যাবে। প্রথমে যে নোংরা কথা বলত, রমযানের লাগামের কারণে ধীরে ধীরে তার ভাল কথা বলার অভ্যাস হয়ে যাবে। সে যখন চিন্তা করবে যে, আমি এখন বাজে কথা বলছি না কেন? তখন সে বুঝবে যে, আমার কথায় কিছু পাপ অন্তর্ভুক্ত ছিল। আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে করি নি, এই আকাংখা ভবিষ্যতেও পূর্ণ হওয়া উচিত। রমাযানের বিষয়টি আরও ব্যাপক হওয়া উচিত। এটি হচ্ছে যাকাত, যার দিকে বিশেষ করে হুযূর (সাঃ) হাদীসটিতে উল্লেখ করেছেন।

তারপর হুযূর (সাঃ) বলেন, কিছু লোক বলে যে, রোযা রাখি না এজন্য যে, স্বাস্থ্য ভাল থাকে না। এটি সম্পূর্ণ ভুল কথা বরং রোযার

কারণে স্বাস্থ্য ভাল হয়। এমন কোন ব্যক্তি নেই, যে রোযাকে ভালভাবে কাটিয়ে পূর্বের তুলনায় ভাল না হয়ে যায়। গত রমযানে আমি এটি বর্ণনা করেছিলাম যে, ইসরাঈলের ডাক্তারগণ সম্ভবতঃ ইসলামের উপর আক্রমণের উদ্দেশ্যে এবং এটি প্রমাণ করার জন্য যে, দেখ, রোযা রেখে বাচ্চাদের, বৃদ্ধদের এবং দুর্বলদের স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যায়। সুতরাং এটি ক্ষতিকারক অভ্যাস। অতঃপর তারা গবেষণা আরম্ভ করে। তাদেরকে আমার এই সাধুবাদটুকু দিতে হবে যে, তারা গবেষণার ক্ষেত্রে সত্য ছিল। কিন্তু নিয়্যত খারাপ ছিল। তারা বড় সংখ্যায় বাচ্চাদের, বৃদ্ধদের এবং দুর্বলদের উপর গবেষণার ফলে আশ্চর্য হয়েছে যে, প্রত্যেক ব্যক্তি রোযা রেখে পূর্বের তুলনায় সুস্থ হয়েছে। বর্তমান বিশ্বে ইসলামের উপর কঠোরভাবে আপত্তিকারীরাও হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর এ কথার সাক্ষ্য দিচ্ছে। তিনি (সাঃ) বলেন, "সাওমু তাসেহ্হু" রোযা পালন কর, তোমাদের স্বাস্থ্য ভাল হবে। কিন্তু আমি মনে করি, এ হাদীসে কেবল দৈহিক স্বাস্থ্যের কথার দিকে ইংগিত নয়, যেভাবে মানুষ সাধারণতঃ মনে করে। "সাওমু তাসেহ্হু" এর অর্থ হচ্ছে তুমি সুস্থ হয়ে যাবে। তুমি অনেক পাপে নিমজ্জিত আছ, আধ্যাত্মিকভাবে তুমি অসুস্থ, তা তুমি জান না। রোযা পালন করলে অনেক রোগ সেরে যাবে, আর তোমাদের আধ্যাত্মিক দেহ সু-স্বাস্থ্যের অধিকারী হবে।

একটি রেওয়ায়াতে হুযূর (সাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, ধৈর্যের মাস অর্থাৎ রমযানের রোযা বুকের তাপ এবং তিক্ততা দূর করে। (আরব) যেহেতু গরম দেশ ছিল সেজন্য গরমের কারণে অনেক সময় সমস্ত দেহ আগুন লেগে যাওয়ার ন্যায় হয়ে যেত। তিনি (সাঃ) বলেন, যত গরমই হোক না কেন, যদি রোযা রাখা হয় তবে হৃদয়ের প্রশান্তির কারণ হবে। তার অভ্যন্তরীণ সুস্থতা দিবে, যাতে জ্বালা নিবারণ হয়ে যাবে। এ জ্বালা অসুস্থতার কারণে বা মন্দ কথার কারণে হয়ে থাকে। এ দুই অবস্থাতেই **রমযান তোমাদের জন্য একটি কল্যাণকর বিষয়। এতে এমন কোন মন্দ দিক নেই, যার কারণে তোমরা এথেকে দূরে চলে যাও। শরীর এবং আধ্যাত্মিক উভয়ের জন্য কল্যাণকর। মঙ্গলই মঙ্গল রয়েছে। সবার চেয়ে বড় কল্যাণ হল, আল্লাহ্তাআলার সাথে মিলিয়ে দেয়া।**

অন্য একটি হাদীস যা সহী বুখারীতে এসেছে যে, রোযা ফেত্না কাফ্ফারা (প্রায়শ্চিত্ত)। এক ব্যক্তি হযরত ওমর (রাঃ)-এর নিকট প্রশ্ন করে, "আন হুযায়ফাতা কালা জুলুসান ইন্দা ওমর,"। হুযায়ফা (রাঃ) বর্ণনা করছেন, আমরা হযরত ওমর (রাঃ)-এর নিকট বসা ছিলাম। "কালা" হযরত ওমর (রাঃ) বল্লেন, "আইয়ুকুম ইয়াহ্ফায কাওলা রসূলুল্লাহে সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম"। তোমাদের মধ্যে হতে কে আছে যার হযরত আক্দস মুহাম্মদ রসূল করীম (সাঃ)-এর এ কথা স্মরণ আছে। "ফীল ফিতনাতে" ফিতনা সম্পর্কে। যেহেতু অনেক ফিত্না আসার কথা ছিল, অনেক সাহাবীর আগ্রহ ছিল, পৃথিবীবাসীকে ফিতনা সম্পর্কে সতর্ক করার। তাই বিশেষ করে ফিতনার কথাগুলি মুখস্ত করে রাখতেন। ফিতনার অর্থ মানুষ এই মনে করত যে, মারামারি হবে, মানুষ দৌড়াদৌড়ি করবে এবং বিশৃংখলা দেখা দিবে। মানুষের এই কথাগুলোর আগ্রহ জন্মে গিয়েছিল, যেভাবে জ্যোতিষীদের জিজ্ঞাসা করা হয় যে, বল আগামীতে কী হবে? হযরত ওমর (রাঃ)-তাদের ধারণার গতি পথকে বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি (রাঃ)-এ বিষয়-বস্তুকে সঠিক রাস্তায় চালানোর জন্য তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন। "তোমাদের কি রসূল করীম (সাঃ)-এর ফিতনা সম্পর্কিত হাদীসটি মনে আছে?" হুযায়ফা ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা অনেক ফিতনার হাদীস মুখস্ত করে রেখেছিলেন। হুযায়ফা বলেন, হ্যাঁ, আমি ফিতনার কথা শুনে রেখেছি। "কালা ইন্নাকা আলায়হে ওয়া আলায়হা লাজরিউন" – তুমি এ কথাগুলির উপর ধৃষ্টতা দেখাচ্ছ। "জরি" বাহাদুর বা সাহসীকে বলা হয়। ধৃষ্টতা বা সাহসীর মধ্যে বাহ্যত: একটি প্রশংসা আছে, আর এর সাথে এ কথাও আছে যে, প্রয়োজনের তুলনায় বেশি সাহস দেখাচ্ছ। তুমি ফিতনার কথাগুলি না বুঝে ধৃষ্টতার সঙ্গে এদিক সেদিক বলে বেড়াচ্ছ বলে হুযায়ফাকে বুঝানোও উদ্দেশ্য ছিল। অতঃপর তিনি (রাঃ) বলেন, "ইন্নাকা আলায়কা আও আলায়হা লাজরিউন." – হুযায়ফা যখন এ কথা শুনেন, তখন বুঝতে পারেন যে ফিতনার প্রকৃত মর্ম ছিল, এর জন্য কোন বিপর্যয়ের যুগ দেখার প্রয়োজন ছিল না। রসূলে করীম (সাঃ) এক চিরস্থায়ী বাস্তবতা বর্ণনা করে দিয়েছিলেন। আর হুযায়ফার আগ্রহ ছিল অন্য কথার। হযরত ওমর (রাঃ) যখন এক ধরনের ধমক দেন এবং প্রকৃত বাস্তবতার দিকে দৃষ্টি দেয়ার জন্য উপদেশ দেন তখন দেখুন হুযায়ফা কি বলেন? "কুল্তু ফিত্নাতুর রাজুলে ফি আলেহী ওয়া মালেহী ওয়া ওয়ালেদেহী ওয়াজারেহী" অর্থাৎ রসূলে করীম (সাঃ) এটি বর্ণনা করছেন যে, মানুষের ফিতনা, "ফি আলেহী" তাঁর নিজ পরিবার-পরিজনের, "ফি মালেহী" তাঁর নিজের সম্পদের, "ওয়ালেদেহী" তাঁর নিজের সন্তান-সন্ততির, "ওয়াজারেহী" তাঁর নিজের প্রতিবেশীর ক্ষেত্রে।

"তুকাফ্ফেরুহা আস্সালাতু ওয়াস্ সাওমু ওয়াস্ সাদাকাতু ওয়াল আমরু ওয়াননেহী" – এখানে এটির যে অনুবাদ দেয়া হয়েছে তাতে মনে হয় যেন এটি কাফ্ফারা (প্রায়শ্চিত্ত)। বস্তুতঃ কাফ্ফারা নয়। তুকাফফেরু এর অর্থ হচ্ছে দূর করে, তিরোহিত করে। আঁ হযরত (সাঃ) আসল ফিতনা সম্পর্কে যে বর্ণনা করেছেন এবং এথেকে সব সময়ের জন্য সতর্ক করেছেন, এটা সেই ফিতনা। এটির অর্থ এই নয় যে, তোমরা ঐ যুগে আস যখন চতুর্দিকে ফ্যাসাদ ছড়িয়ে থাকে, তখন তোমরা এদিকে এ কথাগুলির দিকে দৃষ্টি দাও। ফিতনার যে চিকিৎসা এখানে উল্লেখ করেছেন, তা মু'মিনের প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে সেটি আসল ফিতনাই নয়। যদি ঘরের ফিতনা ঠিক হয়ে যায়, আপনি আপনার পরিবার-পরিজনকে সঠিক রাস্তায় চালান তবে এর চেয়ে ভাল ফিতনার চিকিৎসা নেই। সেই হুযায়ফা যার অধিকাংশ হাদীস মানুষ এমন ফিতনা সম্পর্কে বর্ণনা করে থাকে, যার থেকে মানুষের বিবেকবুদ্ধি ঘুরে যায়। হযরত উমর (রাঃ)-এর উপদেশকে বুঝে নিয়ে ঐ ফিতনার কথা বলেন, যা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ঐ ফিতনার কথা তার স্মরণ ছিল যে, আসলে রসূলে করীম (সাঃ) কথাটি এভাবেই বলেছেন। সুতরাং হাদীসসমূহের উপর চিন্তা করলে বড় বড় তথ্য পাওয়া যায়। ভাসা ভাসা কথা বলে চলে গেলে আপনি কিছুই বুঝতে পারবেন না।

আমি যেভাবে বলেছি যে, **রসূলে করীম (সাঃ)-এর কথা নিজে ব্যাখ্যা করে। নিজের ভিতর মহামর্যাদাসম্পন্ন অর্থ বহন করে।** সুতরাং এ ফিতনার জন্য চিন্তিত হও, যা তোমাদের ঘরে রয়েছে, তোমাদের বাচ্চা এবং সম্পদরূপে হচ্ছে। এটিকে দূর করার জন্য "আস্সালাতু ওয়াস্ সাওম"– দু'টি বিষয়ই রয়েছে। **ঘরকে নামাযে পরিপূর্ণ করে দিন। এখন রমযানের রোযা আসবে। এ ছাড়া এমনিতে রোযাতে পরিপূর্ণ করে দেন, তাহলে প্রত্যেক ধরনের ফিত্না থেকে পরিত্রাণ পাবেন।**

(ওডিও ক্যাসেট থেকে সরাসরি অনূদিত)

অনুবাদ : মাওলানা বশীরুর রহমান
সদর মুরব্বী

রোযা সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য

মূল : আব্দুল মাজেদ তাহের, লণ্ডন

(দ্বিতীয় কিস্তি)

চিররুগী ও ভ্রমণকারীঃ

চিররুগী ও ভ্রমণকারী সম্বন্ধে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন :

"যেসব রুগী ও ভ্রমণকারীদের আশা নেই যে, কখনও আবার রোযা রাখার সুযোগ আসতে পারে যেমন, এক বৃদ্ধ দুর্বল ব্যক্তি বা এক দুর্বল গর্ভবতী স্ত্রীলোক দেখে যে, সন্তান জন্মাবার পরে সন্তানকে দুধ খাওয়াবার কারণে সে রোযা রাখতে অপারগ হয়ে যাবে এবং সারা বছর এ রকম দুর্বলতা থাকবে, এসব ব্যক্তিদের জন্যে ইহা সিদ্ধ হতে পারে যে, তারা রোযা রাখবে না। কেননা, তারা রোযা রাখতেই পারে না। আর ফিদিয়া দিয়ে দেয় (একটি রোযার পরিবর্তে একজন গরীবকে খাদ্য দান –অনুবাদক)। ফিদিয়া কেবল খুবই বৃদ্ধ বা তাদের মত লোকদের জন্যে হতে পারে, যারা কখনই রোযা রাখার সামর্থ্য রাখে না। বাকী অন্য কারও জন্যে ইহা সিদ্ধ নয় যে, কেবল ফিদিয়া দিয়ে রোযা না রাখার জন্যে অপারগ মনে করা যেতে পারে। সাধারণ মানুষদের মধ্যে যারা স্বাস্থ্য ফিরে পাবার পরে রোযা রাখার যোগ্যতা অর্জন করে তাদের বেলায় ফিদিয়ার কথা মনে করা বি'দাত বা নতুন উদ্ভাবনের দরজা খোলার শামেল। যে ধর্মের মধ্যে সাধনা ও সংগ্রাম নেই আমাদের নিকট ঐ ধর্মের কোন মূল্য নেই। এরূপেই খোদা প্রদত্ত দায়িত্ব কাঁধ থেকে ফেলে দেয়া বড় পাপ। আল্লাহ্তাআলা বলেন, যেসব লোক আমার পথে সাধনা ও সংগ্রাম করে তাদেরকেই সঠিক পথ প্রদর্শন করা হবে (ফাতাওয়া আহমদীয়া, পৃষ্ঠা ১৮৩)।

রোযা রেখে ভ্রমণ আরম্ভ করা

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) বলেন, "ভ্রমণ সম্বন্ধে আমার বিশ্বাস ও ধারণা ইহাই। সম্ভবতঃ কতক ফিকাহ্বিদের এর সাথে মতভেদ সৃষ্টি হতে পারে যে, যে ভ্রমণ সেহরীর পরে আরম্ভ হয়ে সন্ধ্যায় শেষ হয় উহা রোযার দিক থেকে ভ্রমণ নয়। ভ্রমণে রোযা রাখতে শরীয়ত নিষেধ করে কিন্তু রোযার মধ্যে ভ্রমণ করা নিষেধ করে না। অতএব যে ভ্রমণ রোযা রাখার পরে আরম্ভ হয়ে ইফতারের পূর্বে শেষ হয়ে যায় রোযার দিক থেকে উহা ভ্রমণ নয়। রোযার মধ্যে ভ্রমণ আছে, ভ্রমণে রোযা নেই (আল্ ফযল ২৫-৯-১৯৪২ ইং)।

ভ্রমণে রোযার চারটি ধরন বা অবস্থা হতে পারে :

(১) .....যদি যাত্রা আরম্ভ হয় অর্থাৎ পায়ে হেঁটে বা যানবাহনে এবং চলতে থাকতে হয় তাহলে রোযা রাখবে না। কেননা, এমতাবস্থায় রোযা পরিত্যাগ করা আবশ্যক।

(২) ..... যদি ভ্রমণের সময়ে কোন স্থানে রাত কাটাতে হয় এবং যদি সহজসাধ্য হয় তাহলে রোযা রাখা যায়। অর্থাৎ রোযা রাখা বা না রাখা উভয়েরই অনুমতি আছে যখন কিনা সারাদিন সেখানে কাটাতে হবে।

(৩) ..... সেহ্রী খাওয়ার পরে যদি ভ্রমণ আরম্ভ হয় আর ইফ্তারের আগেই ভ্রমণ শেষ হয় অর্থাৎ ঘরে ফিরে আসার সম্ভাবনা অধিক থাকে তাহলে রোযা রেখে নাও নচেৎ না রাখারও অনুমতি আছে।

(৪) ..... যদি ভ্রমণকালীন সময়ে কোন স্থানে পনর দিন বা এ থেকে অধিক সময় অবস্থান করতে হয় তাহলে সেখানে সেহ্রীর ব্যবস্থা করা হোক এবং রোযা রাখা হোক।

ভ্রমণের পরিমাপ কী?

এ প্রসঙ্গে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন, "আমার ধর্ম এই যে, মানুষ যেন নিজের ওপরে অধিক কাঠিন্য আরোপ না করে। সাধারণতঃ যাকে ভ্রমণ বলে হোক না তা দু'তিন ক্রোশই (২ মাইল এক ক্রোশ হয় – অনুবাদক)। এর মধ্যে কসর ও সফরের মসলাগুলোর ওপরে আমল করো।"

"ইন্নামাল আ'মালু বিন্নিয়্যত" – কখনও কখনও আমরা দুই তিন মাইল নিজেদের বন্ধুদের সাথে হাঁটতে হাঁটতে চলে যাই কিন্তু কারও মনে এ ধারণা হয় না যে, আমরা ভ্রমণে আছি। কিন্তু যখন মানুষ নিজেদের বিছানা-পত্র নিয়ে ভ্রমণের উদ্দেশ্যে যাত্রা আরম্ভ করে তখন ভ্রমণকারী হয়। শরীয়তের ভিত্তি সময়ের ওপরে নয়। যাকে তোমরা সাধারণতঃ ভ্রমণ মনে করো উহাই ভ্রমণ। আর যেভাবে খোদার বিধি-নিষেধের ওপরে আমল করা হয়ে থাকে তেমনভাবেই তাঁর দেয়া অবকাশের ওপরেও আমল করা উচিত। ফরযও খোদার পক্ষ থেকে আর অবকাশও খোদার পক্ষ থেকে" (আল্ হাকাম্ ৫ম খণ্ড, ১৭-২-১৯০১ ইং পৃ:১৩)।

* .....হুযূর আলায়হেস সালাম হযরত পীর সিরাজুল হক সাহেব (রাঃ)-এর নামে এক পত্রে বলেন,

"মান কানা মিনকুম মারীযান আও আলা সাফারিন ফা'ইদ্দাতুম মিন আইয়্যামিন উখার" – যদি তোমরা রুগ্ন হও বা কোন ভ্রমণে, হোক না তা কম বা বেশী তাহলে ঐ উভয় অবস্থাতে রোযা অন্য দিনগুলোতে রেখে নিবে। সুতরাং আল্লাহ্তাআলা ভ্রমণের কোন পরিমাপ নির্ধারণ করেন নি। আর নবী করীম (সাঃ)-এর হাদীসেও কোন পরিমাপ পাওয়া যায় না। বরং সাধারণ্যে প্রচলিত অর্থে যাকে ভ্রমণ বলা হয় উহাই ভ্রমণ। এক মঞ্জিলের কম (অর্থাৎ এক দিনের কম ভ্রমণ) যাতায়াত হলে উহাকে ভ্রমণ বলা যেতে পারে না (মকতুবাত ৫ম খণ্ড, নম্বর ৫, পৃষ্ঠা ৮১)।

দিনমজুরদের জন্যে রোযাঃ

কতক দিনমজুর রোযা রাখতে কষ্ট মনে করে থাকে তারা কী এ কারণে রোযা পরিত্যাগ করতে পারে? রোযা রাখতে কারও কষ্ট হয় না। কুরআন মজীদ এ কারণের উল্লেখ করে নি আর হাদীসসমূহকে এর কোন ব্যাখা নেই যদিও দিন মজুর তখনও ছিলো। অবশ্য যদি দুর্বলতা থাকে এবং রোযা রাখার সহ্য ক্ষমতা না থাকে তাহলে তা রুগ্ন সম্পর্কিত আদেশের আওতাধীন অথচ রুগীর ওপরে রোযা ফরয নয়।

হযরত আকদস মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সামনে যখন এ প্রশ্ন উত্থাপিত হলো যে কখনও কখনও রমযান এমন ঋতুতে আসে যে, কৃষকদের কাজের খুব চাপ থাকে যেমন, মাঠে বীজ বপন করা, ফসল কাটা, এরূপে দিন মজুর যারা দিন মজুরী করে দিন কাটায় তারা সকলে রোযা রাখে না। তাই তাদের ব্যাপারে নির্দেশ কী?

এর ওপরে হযরত আকদস (আঃ) বলেন – ইন্নামাল আ'মালু বিন্নিয়্যত। এ সব লোক নিজেদের অবস্থা গোপন রাখে। প্রত্যেক ব্যক্তি খোদা-ভীতি ও পবিত্রতা সহকারে নিজের অবস্থা সম্বন্ধে চিন্তা করুক। যদি কেউ নিজের জায়গায় দিন মজুর রাখতে পারে তাহলে এমন করুক নচেৎ 'রুগী' সম্পর্কিত আদেশের আওতাধীন হবে, পরে সুবিধামত রেখে নিবে (আল্ বদর, ২৬-৯-১৯০৭ ইং)।

ঋতুবতী, প্রসূতী বা স্তন্যদায়ীনি ও গর্ভবতীঃ

ঋতুবতী মহিলারা রোযা রাখতে পারে না। ঋতুবতীদের প্রসঙ্গে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, আঁ হযরত (সাঃ)-এর যুগে আমরা ঋতুর কারণে রোযা রাখতাম না। পরে আমাদের ঐ রোযাগুলো রাখার নির্দেশ প্রদান করা হলো (সুনানি ইবনে মাজাহ্, কিতাবুস্ সাওম বাবু মা জায়া ফিল কাযায়ে রমাযান)।

*.....নেফাসক্লিষ্ট মহিলাদের জন্যেও এই আদেশ যে, তারা রোযা রাখতে পারে না। কিন্তু যখন পরে এ কারণ দূরীভূত হয়ে যায় অর্থাৎ ঋতুবতী ঋতু থেকে পবিত্র হয় আর নেফাসের দিন (বাচ্চা প্রসবের পরে চল্লিশ দিন – অনুবাদক) গুলো শেষ হওয়ার পরে ভাঙ্গতি রোযাগুলো কাযা করা অবশ্য-কর্তব্য এবং এ রোযাগুলো তাদের রাখতে হবে।

*.....প্রসূতী এবং গর্ভবতী মহিলাদের সম্পর্কে হাদীসে এসেছে: রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাঃ) বলেছেন, "আল্লাহ্তাআলা ভ্রমণকারীদের অর্ধেক নামায মাফ করে দিয়েছেন এবং গর্ভবতী ও প্রসূতী বা দুগ্ধ-দানকারী মহিলাদের রোযা থেকে অবকাশ দিয়েছেন" (তিরমিযী, আবওয়াবুস্ সাওম, বাবু মা জায়া ফি রুখসাতি ফিল ইফতারী লিল হামিলি ওয়াল মারযা')।

*.....হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, আঁ হযরত (সাল্লাঃ) গর্ভবতী মহিলা এবং স্তন্যদায়িনী মহিলাদের রোযা থেকে অবকাশ দিয়েছেন (সুনানে ইবনে মাজাহ্ কিতাবুস্ সাওম বাবু মা জায়া ফিল ইফতার লিল হামিলি ওয়াল মারযা')।

অর্থাৎ এরা উভয়েই নিজেদের রোযা না রাখার কারণ শেষ হওয়ার পরে ভাঙ্গা রোযাগুলো পুরো করে নিবে। যদি সামর্থ্য থাকে তবে ফিদিয়াও আদায় করে দিবে। ইহা এ কথার কাফ্ফারা হবে যে, রমযানের কল্যাণমণ্ডিত মাসে ইবাদত পালন করা থেকে তারা বঞ্চিত রয়েছে। যদি ফিদিয়া আদায় করার সামর্থ্য না থাকে তাহলে রোযা যথেষ্ট।

যদি কোন মহিলার এমন অবস্থার সম্মুখীন হতে হয় যে, একবার প্রসূতী আবার অন্য সময়ে গর্ভবতী তাহলে তার ক্ষেত্রে রোযা মাফ এবং কেবল ফিদিয়া প্রদান যথেষ্ট। এভাবে অতিবৃদ্ধ ও চিররুগীর জন্যেও এই আদেশ। স্বাস্থ্যগত কারণে ভবিষ্যতেও যাদের রোযা রাখার সম্ভাবনা নেই সেক্ষেত্রে তারা কেবল ফিদিয়া আদায় করে দেবে।

ছাত্র-ছাত্রীর জন্যে রোযাঃ

যে সব ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষার প্রস্তুতির কাজে ব্যস্ত তাদের জন্যে রোযা রাখার ব্যাপারে এ নির্দেশ যে, রোযা রাখার কারণে দৈনন্দিন ব্যস্ততা পরিত্যাগ করার আদেশ দেয়া হয় নি। এজন্যে দৈনন্দিন কাজ-কর্মের কারণে যদি এক ব্যক্তি রোযার কষ্ট বরদাশ্ত করতে অপারগ হয় তাহলে সে রুগীর আদেশের আওতাধীন। কিন্তু এ প্রসঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তার পদক্ষেপের জন্যে দায়ী হবেন এবং তার সাথে তার নিয়্যত ও অবস্থানুযায়ী আল্লাহ্তাআলা ব্যবহার করবেন। মোট কথা নিজের অবস্থানুযায়ী সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্যে মানুষ নিজেই মুফতী।

যে ব্যক্তি রোযা রাখতে গিয়ে রুগ্ন হয়ে যায় যদিও সে ইতোপূর্বে রুগী ছিলো না তার জন্যে রোযা মাফ। যদি তার অবস্থা সর্বদাই এরকম থাকে তাহলে কখনও তার ওপরে রোযা অবশ্য করণীয় হবে না। যদি কোন ঋতুতে এমন অবস্থা হয় তাহলে অন্য সময়ে রেখে নিবে। অবশ্যই তাকওয়ার ভিত্তিতে কাজ করা উচিত। স্বয়ং নিজে চিন্তা করে নিবে কেবল বাহানা যেন না হয় সত্যিকারের ব্যাধি হয় (আল্ ফযল, ২২/৫/১৯২২)।

কতক লোক ইফরত (বাড়িয়ে বলা) ও তফরীত (কমিয়ে বলা)-এর শিকার হন। কতক লোক তো কোন রোগ-ব্যাধি ছাড়া বা কোন বিধিসম্মত কারণ ছাড়া রোযা ছেড়ে দেয় এবং কতক লোক প্রত্যেক রুগী, বৃদ্ধ, শিশু, গর্ভবতী ও স্তন্যদায়িনী মহিলা থেকেও এ আশা করে যে, তারা যেন রোযা রাখে। এ উভয় পদ্ধতি ঠিক নয়। কেননা, একেতো শরীয়তের বিধি-বিধানে শক্তি প্রয়োগ নেই। অন্য দিকে অবকাশগুলো থেকেও উপকৃত হওয়া আবশ্যক। এ কারণেই ইসলাম কতক আদেশ-নিষেধের ব্যাপারে কতক শর্তাদি নির্ধারিত করে দিয়েছে। রোযার জন্যেও এই শর্ত যে, যদি মানুষ ব্যাধিগ্রস্ত হয়, হোকনা সে রুগ্ন হওয়ার অযোগ্য বা এমন অবস্থায় থাকে যাতে রোযা রাখাতে তার নিশ্চিৎ বিশ্বাস তাকে অসুস্থ করে দেবে অথবা রোগ বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা থাকে যেমন, গর্ভবতী, স্তন্যদায়িনী মহিলা বা এমন বৃদ্ধ ব্যক্তি যার শক্তি নিঃশেষিত হয়ে গেছে এবং রোযা তার জীবনের বাকী কাজ-কর্ম থেকে বঞ্চিত করে দেয় তাদের রোযা রাখা উচিত নয়। ইফরত ও তফরীত থেকে রক্ষা পাওয়া উচিত। সামান্য কারণাদি এবং দুর্বলতা ও ক্লান্তি হবার বাহানায় রোযা পরিত্যাগ করাও উচিত নয় এবং প্রকৃত কারণ থাকা সত্ত্বেও রোযা রাখা উচিত নয়।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন, "যদি আল্লাহ্তাআলা চাইতেন তাহলে অন্য উম্মতের মত এ উম্মতেও কোন গ্রেপ্তারের ব্যবস্থা রাখতেন না, কিন্তু তিনি কল্যাণের জন্যে গ্রেপ্তারের ব্যবস্থা রেখেছেন। আমার নিকট নীতি ইহাই যে, যখন মানুষ সত্যবাদী ও পূর্ণ নিষ্ঠার সাথে খোদাতাআলার নিকট আবেদন করে যে, এ মাসে আমাকে বঞ্চিত রেখো না, তাহলে খোদাতাআলা তাকে বঞ্চিত রাখেন না। আর এমন অবস্থায় যদি মানুষ রমযান মাসে অসুস্থ হয়ে যায় তাহলে এ ব্যাধি তার পক্ষে রহমতের কারণ হয়। কেননা, প্রত্যেক কর্মের ভিত্তি হলো নিয়্যতের ওপরে। মু'মিনের উচিত যে, সে নিজ সত্তা দ্বারা নিজেকে খোদাতাআলার রাস্তায় সাহসী প্রমাণিত করে। যে ব্যক্তি রোযা থেকে বঞ্চিত থাকে কিন্তু তার প্রাণে এ আবেগের সাথে নিয়্যত এই থাকে যে, হায়! যদি আমি সুস্থ থাকতাম তাহলে রোযা

রাখতাম আর তার অন্তর এ কথায় বিলাপ করে তাহলে ফিরিশ্‌তা তার জন্যে (রোযা) রাখবে। তবে শর্ত এই যে, বাহানা যেন না হয়। তাহলে খোদাতাআলা অবশ্যই তাকে পুণ্য থেকে বঞ্চিত করবেন না" (ফাতাওয়া আহমদীয়া, পৃষ্ঠা ১৭৫)।

ফিদিয়া ঃ

সাধারণ নির্দেশ এই যে, মানুষ যেন রোযাও রাখে এবং যদি সামর্থ্য থাকে তাহলে ফিদিয়াও দেয়। রোযা রাখা দ্বারা ফরয পালন করা হবে এবং ফিদিয়া আদায় করা দ্বারা সুন্নত পালিত হবে এবং উহার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হবে যে, আল্লাহ্‌তাআলা আমাকে এই ইবাদত পালন করার সৌভাগ্য দান করেছেন। কেননা, রোযা রেখে যে ফিদিয়া আদায় করে সে অধিক পুণ্যের অধিকারী হয়। কেননা, রোযা রাখার সৌভাগ্য লাভ করার জন্যে খোদাতাআলার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয়।

রমযানের রোযার ফিদিয়া ঐ ব্যক্তির জন্যে আবশ্যকীয় নয়, যে সাময়িকভাবে রুগ্ন হওয়ার কারণে কতিপয় রোযা রাখতে পারে নি। কেবল ঐ নিয়্যতে ফিদিয়া দেয় যে, আল্লাহ্‌তাআলা তাকে অসুস্থতা বা ভ্রমণের কারণ ব্যতিরেকে রোযা রাখার সৌভাগ্য দান করেছেন, কোন রোযা ভাঙ্গা যায় নি। আর রমযানের ঐ রোযাগুলোর প্রতিদান থেকে বঞ্চিত করেন নি, যে রোযাগুলো অপারগতার কারণে পরিত্যাগ করতে হয়।

রমযানের রোযার অবশ্য দেয় ফিদিয়া কেবল ঐ সব সামর্থ্যবান লোকদের জন্যে যাদের ব্যাপারে এর কোন নিশ্চয়তা নেই যে, খুব নিকটবর্তী সময়ে তারা ওগুলোর কাযা করতে পারবে। ভাঙ্গতি রোযাগুলো (রেখে নেয়া) যেমন খুবই বৃদ্ধ যাদের শক্তি একেবারেই লোপ পেয়েছে বা কোন চিররুগী, বা গর্ভবতী বা প্রসূতী (স্তন্যদায়িনী মহিলা)। যদি এসব লোকের স্বাচ্ছন্দ্য লাভ হয় তাহলে প্রত্যেক রোযার বদলে এক ব্যক্তিকে দু' বেলা খাদ্য দেবে বা এর সম পরিমাণ অর্থ কাউকে দিয়ে দেয়া আবশ্যক।

যদি সাময়িক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয় এবং পরে দূরীভূত হয় তাহলে ফিদিয়া আদায় করা হোক বা না হোক রোযা কিন্তু রাখতেই হবে। কেননা, ফিদিয়া দিয়ে দেবার কারণে রোযা নিজ সত্তায় অকেজো হয়ে যায় না। ইহা তো বলা এই কথার বদলে যে, সে ঐ সব দিনে অন্যান্য মুসলমানের সাথে একত্রিত হয়ে এ ইবাদত পালন করতে পারে নি।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর নিকট এক ব্যক্তি প্রশ্ন করলেন যে, আমি এর আগে কখনও রোযা রাখি নি, এর ফিদিয়া কী? এর ওপরে তিনি বলেন:

"খোদাতাআলা কোন ব্যক্তিকে তাঁর সামর্থ্যের বাইরে রেখে দেন নি। সামর্থ্যানুযায়ী বিগত দিনের ফিদিয়া আদায় করে দাও। ভবিষ্যতের জন্যে অঙ্গীকার করো যে, সব রোযা রাখবো" (আল্ বদর, ১ খণ্ড, নম্বর ১২, ১৬১-১৯০৩ ইং পৃষ্ঠা ৯১)।

ফিদিয়ার পরিমাণঃ

ফিদিয়ার পরিমাণের ব্যাপারে নির্দেশনা-নীতি এই যে, 'মিন আওসাতি মা তুত্‌'ইমূনা আহলিকুম' অর্থাৎ তোমরা সাধারণতঃ যে খাবার তোমাদের পরিজনকে খাওয়াইয়া থাকো (সূরা মায়েদা: ৯০ আয়াত) অর্থাৎ নিজেদের মধ্যম প্রকারের খাবার অনুযায়ী খাবার খাওয়ানো উচিত।

হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) উহার পরিমাণ গমের আকারে অর্ধেক সা' অর্থাৎ প্রায় পৌণে দুই সের বর্ণনা করেছেন। ইহা একটি ভাঙ্গা রোযার জন্যে প্রদেয় ফিদিয়া, যা দুই ওয়াক্ত খাবার জন্যে যথেষ্ট হবে।

ফিদিয়া কাকে দিতে হবে?

ইহা জরুরী নয় যে, ফিদিয়া কেবল এমন গরীবকেই দেয়া যায়, যে রোযা রাখে। আসল উদ্দেশ্য পাবার উপযুক্ত ও ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান করা, হোক না সে রোযাদার বা কোন কারণে রাখতে পারে নি। এরূপে ফিদিয়া দেয়া তাদের জন্যে বাধ্যকর যারা আদায় করার সার্মথ্য রাখে নচেৎ একজন অপারগ লোকের জন্যে অনুশোচনা, তওবা, ইস্তেগফার, দোয়া ও যিক্‌রে ইলাহী বেশী বেশী পাঠ পূরণ করে দেবে। ফিদিয়ার অর্থ জামাতের ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে একত্রিত করতে হবে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (রাঃ) বলেনঃ

"যেসব রুগীর ও ভ্রমণকারীর আশা নেই যে, কখনও রোযা রাখার সুযোগ আসবে যেমন এক বৃদ্ধ লোক বা একজন দুর্বল গর্ভবতী মহিলা যারা দেখে যে, সন্তান জন্ম নেবার পরে সন্তানের দুধ পান করার কারণে তারা পুনরায় অপারগ হয়ে যাবে এবং সারা বছর এভাবে কাটাতে হবে এরূপ ব্যক্তিদের জন্যে ইহা সিদ্ধ হবে যে, তারা রোযা রাখবে না। কেননা, তারা রোযা রাখতেই পারে না এবং তারা ফিদিয়া দেবে।

ফিদিয়া কেবল অতীব বৃদ্ধ বা এরকম লোকদের জন্যে হতে পারে যারা রোযা রাখার ক্ষমতা কখনও রাখে না। অবশিষ্ট কারও জন্যে ইহা সিদ্ধ নয় যে, কেবল ফিদিয়া আদায় করে দিলে তাদেরকে রোযা রাখার অপারগ মনে করা যেতে পারে। সাধারণ লোকদের মধ্যে যারা স্বাস্থ্য ফিরে পেয়ে রোযা রাখার সামর্থ্যলাভ করে তাদের বেলায় কেবল ফিদিয়া দিবার ধারণা করাতে বি'দাত এর দরজা খুলে দেয়া হয় (ফাতাওয়া আহমদীয়া, ১৮৩ পৃষ্ঠা)।

ফিদিয়া পুনরায় রোযা রাখার সৌভাগ্যের কারণ হতে পারেঃ

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন,

"একবার আমার মনে হোল যে, এ ফিদিয়া কী কারণে নির্ধারিত করা হোল? তখন বুঝতে পারলাম যে, ইহা এজন্যে যে, তার যেন পুনরায় রোযা রাখার সৌভাগ্য লাভ হয়। খোদার সত্তাই সৌভাগ্য দিয়ে থাকেন আর প্রত্যেক ব্যক্তির খোদার নিকটেই প্রত্যাশী হওয়া দরকার। তিনি একক ক্ষমতার অধিকারী। যদি তিনি চান এক যক্ষা রোগীকেও রোযা রাখার সামর্থ্য দিতে পারেন। এজন্যে উত্তম পদ্ধতি ইহাই যে, এরকম মানুষ যখন দেখে যে, রোযা থেকে বঞ্চিত থেকে যায় তখন দোয়া করুন যে, হে আল্লাহ্! ইহা তোমার কল্যাণমণ্ডিত মাস, আমি এতে বঞ্চিত থেকে যাচ্ছি আর জানা নেই যে, আগামী বছর বাঁচি না মরি অথবা ভাঙ্গা রোযাগুলি রাখতে পারিনা না পারি এজন্যে তাঁর নিকট সৌভাগ্য কামনা করুন আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, এমন হৃদয়ের অধিকারী ব্যক্তিকে খোদা শক্তি ও সামর্থ্য দিয়ে দিবেন।

(২৬শে ডিসেম্বর '৯৭-এর সাপ্তাহিক আল ফযল ইন্টারন্যাশনালের সৌজন্যে) (চলবে)

অনুবাদ : মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

সালানা জলসায় আগমনের গুরুত্ব

বিজ্ঞপ্তি

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, ইমাম মাহ্দী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ)

(এক) "এই অধমের নিকট বয়াতপূর্বক এ জামা'তে প্রবেশকারী সকল নিষ্ঠাবান ব্যক্তিবর্গের জেনে রাখা দরকার যে, বয়াত করার উদ্দেশ্য এই যে, দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণ যেন নিবারিত হয় আর স্বীয় মহান প্রভু এবং রসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের ভালবাসা প্রাণে সমুন্নত থাকে। আর সংসার বর্জনের অবস্থা এরূপ হয়ে যায় যদ্বারা আখেরাতের সফর যেন দুর্বিসহ মনে না হয়; কিন্তু এ উদ্দেশ্য লাভের জন্যে পুণ্য সংস্পর্শে থাকা ও জীবনের এক অংশ এ পথে ব্যয় করা আবশ্যক। যদি খোদাতাআলা চান, তাহলে কোন নিশ্চিৎ দলীল প্রত্যক্ষ করার ফলে যেন শক্তিহীনতা ও দুর্বলতা ও আলস্য দূরীভূত হয় এবং দৃঢ় প্রত্যয় জন্মাবার পরে উৎসাহ ও উদ্দীপনা এবং ভালবাসার আবেগ সৃষ্টি হয়ে যায়। সুতরাং এ বিষয়ে সর্বদা চিন্তায় থাকা উচিত এবং এমনভাবে চিন্তা করা উচিত যেন খোদাতাআলা এর সৌভাগ্য দান করেন এবং যতক্ষণ পর্যন্ত এর সৌভাগ্য না হয়, কখনও কখনও অবশ্যই সাক্ষাৎ লাভ হওয়া উচিত। কেননা, বয়াত গ্রহণের পর সাক্ষাৎ লাভের কোন পরওয়া না করা এমনই এক বয়াত গ্রহণ যাতে কোনই কল্যাণ নেই এবং ইহা নিছক আনুষ্ঠানিক বয়াতের অন্তর্ভুক্ত। আর যেহেতু প্রত্যেকের জন্যে মনের দুর্বলতা বা অক্ষমতা বা সফরের দূরত্বের কারণে এরূপ সুযোগ হতে পারে না যে, সে আমার সংস্পর্শে এসে থাকে বা বৎসরে কয়েক বার কষ্ট করে সাক্ষাতের জন্যে এখানে আসে। কেননা, অধিকাংশ হৃদয়ে এখনও এরূপ উৎসাহ-উদ্দীপনা জাগ্রত হয় নি যে, সাক্ষাতের জন্যে বড় বড় দুঃখ ও বড় বড় বাধা-বিপত্তিকে সহ্য করতে পারে।

এ কারণে অবস্থাদৃষ্টে উপলব্ধি করা যায় যে, বছরে এরূপ ৩দিন ব্যাপী জলসার আয়োজন করা হোক যার মধ্যে নিষ্ঠাবান ব্যক্তিবর্গ, যদি আল্লাহ্ চাহেন, সুস্থ থাকেন, অবকাশ পান, এবং কঠিন প্রতিবন্ধকতা না থাকে তাহলে যেন তারা নির্ধারিত দিনে উপস্থিত হয়ে যান।

সুতরাং আমার মতে উত্তম ইহাই যে, ঐ তারিখ যেন ২৭ শে ডিসেম্বর থেকে ২৯ শে ডিসেম্বর পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়। অর্থাৎ আজকের পরে যা কিনা ৩০ শে ডিসেম্বর ১৮৯১ এর পরে আগামীতে আমাদের জীবনে ২৮ শে ডিসেম্বর তারিখ যখন আসে তখন যতটুকু সম্ভব সকল বন্ধুকে কেবল রব্বানী কথাবার্তা শুনার জন্যে, দোয়ায় অংশ গ্রহণ করার জন্যে ঐ তারিখে এখানে এসে যাওয়া উচিত। আর এ জলসায় এমন **মাহাত্ম্যপূর্ণ ও তত্ত্বজ্ঞানে ভরপুর কথাবার্তা** শুনানোর ব্যবস্থা থাকবে যা ঈমান, প্রতীতি ও তত্ত্বজ্ঞানে **বুৎপত্তি দানের জন্যে আবশ্যক**। আর ঐ সব বন্ধুদের জন্যে বিশেষ দোয়া, এবং বিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ করে যতটুকু সম্ভব রহীম ও রহমান খোদার সমীপে চেষ্টা করা হবে যেন খোদাতাআলা তাদেরকে নিজের দিকে আকর্ষণ করেন। আর তিনি তাদেরকে গ্রহণ করেন এবং তাদেরকে পবিত্র পরিবর্তন দান করেন। আর এসব জলসায় একটি সাময়িক কল্যাণ তাদের ইহাও লাভ হবে যে, প্রত্যেক নতুন বছরে যেসব নতুন ভাই এ জামাতে দাখেল হবেন তারা ঐ নির্ধারিত তারিখে একত্রিত হয়ে তাদের পুরাতন ভাইদের মুখ দেখে নিবেন এবং পরিচিত হয়ে পরস্পরে আত্মীয়তার বন্ধন ও পরিচিতি বৃদ্ধি পেতে থাকবে আর যেসব ভাই এ সময়ে এ নশ্বর দুনিয়া থেকে চলে যাবেন এ জলসায় তাদের জন্যে মাগফেরাতের দোয়া করা হবে। আর সব ভাইকে আধ্যাত্মিকভাবে একই সত্তায় পরিণত করার জন্যে এবং তাদের অভ্যন্তরস্থ কাঠিন্য, অপরিচিতি ও কপটতা দূরীভূত করার জন্যে মহামহিম ও প্রতাপান্বিত আল্লাহ্র সমীপে চেষ্টা করা হবে। এছাড়াও বহু আধ্যাত্মিক কল্যাণ লাভ হবে যা ইনশাল্লাহুলকাদীর সময়ে সময়ে প্রকাশিত হতে থাকবে। কম আয়ের লোকদের জন্যে উচিত হবে যেন তারা পূর্ব থেকেই জলসায় যোগদানের চেষ্টায় রত থাকেন। আর যদি প্রচেষ্টা ও স্বল্প-তুষ্ট পদ্ধতিতে খরচ থেকে কিছু কিছু বাঁচিয়ে পথ খরচের জন্যে প্রত্যেক দিন বা মাসে মাসে কিছু না কিছু জমা করে পৃথক রেখে দেন তাহলে সময় মত পথ খরচের টাকা সংকুলান হয়ে যাবে। মোটকথা এ পথ খরচের টাকা এমনিতেই যোগাড় হয়ে যাবে। উত্তম ইহাই হবে যে, যেসব বন্ধু এ প্রস্তাবে রাজী হবেন তারা লিখিতভাবে বিশেষ করে আমাকে জানাবেন যেন আলাদা তালিকায় তাদের নাম তালিকাভুক্ত হয়ে সংরক্ষিত থাকে। তারা শক্তি ও সামর্থ্যে যতটুকু কুলোয় নির্ধারিত তারিখে উপস্থিত হওয়ার জন্যে নিজের ভবিষ্যত জীবনের জন্যে যেন অঙ্গীকার করে নেয় এবং জীবনের বিনিময়ে দৃঢ় সংকল্প নিয়ে উপস্থিত হয়ে যায়। এ অবস্থায় কেবল ব্যতিক্রম হবে যে, এমন প্রতিবন্ধকতা এসে যায় যাতে সফর করা সাধ্যের বাইরে চলে যায়। আর এখন ২৭ শে ডিসেম্বর, ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে ধর্মীয় পরামর্শের জন্যে জলসা করা হয়েছে। এ জলসায় যেসব বন্ধু কেবল আল্লাহ্র খাতিরে সফরের কষ্ট বরদাশ্ত করে এসেছেন খোদা তাদের উত্তম পুরস্কার দান করুন এবং তাদের প্রতিটি পদক্ষেপে আল্লাহ্তাআলা পুণ্য দান করুন। আমীন সুম্মা আমীন" (মজমুয়া ইশ্তেহারাত, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩০২-৩০৪)।

জলসা সালানায় অনুপস্থিত বন্ধুগণের জন্যে দুঃখ প্রকাশ

(দুই) "বহু লোক আমাদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবহিত নয় যে, আমরা তাদেরকে কোন পর্যায়ের মানুষ গড়ার প্রত্যাশা করি? আমাদের যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে খোদাতাআলা আমাদেরকে আবির্ভূত করেছেন উহা ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত লোকেরা বারংবার এখানে (অর্থাৎ কাদিয়ানের জলসায়) না আসে এবং আসার জন্যে মোটেও যেন বিরক্তি বোধ না করে।

যে ব্যক্তি এরূপ ধারণা করে যে, (জলসায়) আসতে তার ওপরে বোঝা পড়ে বা এরূপ মনে করে যে, এখানে অবস্থানকালে আমাদের ওপরে বোঝা চাপে, তার ভয় করা উচিত যে, সে শির্কে

নিপতিত। আমাদের বিশ্বাস তো এই যে, যদি সমগ্র জগৎ আমাদের পরিবার হয়ে যায় তাহলে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ কাজসমূহ সুসম্পন্ন করার জন্যে আমাদের খোদাতাআলা আমাদের অভিভাবক। আমাদের ওপরে কোন বোঝা নেই। আমাদের বন্ধুদের দেখলেই বড় আনন্দ লাগে। ইহা ধোঁকা। ইহা অন্তর থেকে দূরে নিক্ষেপ করা উচিত। আমি কতককে এ কথা বলতে শুনেছি যে, আমরা এখানে বসে কেন হযরত সাহেবকে কষ্ট দেবো। আমরা তো নিষ্কর্মা। এখানে বসে কেন অন্ন ধ্বংস করবো। তারা ইহা মনে রাখুন যে, ইহা শয়তানী কুমন্ত্রণা যা কিনা শয়তান তাদের অন্তরে প্রবেশ করে দিয়েছে যেন তারা এখানে স্থায়ী ভাবে না থাকে" (মলফুযাত, ১ম খণ্ড, ৪৫৫ পৃঃ)।

(তিন) "এ জলসার উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, যেন প্রত্যেক নিষ্ঠাবান ব্যক্তির সামনা সামনি ধর্মীয় জ্ঞান লাভের সুযোগ ঘটে আর তাদের জ্ঞানের পরিধি তত্ত্বজ্ঞান সমৃদ্ধ হয়। আর এর মধ্যে এসব কল্যাণসমূহও নিহিত যে, সাক্ষাৎ লাভে সকল ভাইদের পরিচিতির পরিধি ব্যাপকতর হয় এবং এ জামাতে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন সুদৃঢ় হয়.....সুতরাং ইহা আবশ্যক যে, এ জলসায়, যাতে বহুবিধ কল্যাণজনক উপাদান নিহিত, প্রত্যেক এমন ব্যক্তি যার পথ-খরচের সামর্থ্য আছে সে যেন নিজের লেফ ইত্যাদি প্রয়োজনীয় দ্রব্য সহকারে অবশ্যই এতে যোগদান করে এবং আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সাঃ)-এর পথে সামান্য থেকে সামান্য বাধা-বিপত্তির পরওয়া না করে। খোদাতাআলা পুণ্যবান বান্দার প্রতিটি পদক্ষেপে সওয়াব দেন এবং তাঁর পথে কোন পরিশ্রম ও দুঃখ- ক্লেশ বিফলে যায় না। আর বারংবার লেখা হচ্ছে যে, এ জলসাকে সাধারণ সম্মেলনাদির ন্যায় মনে কোর না। ইহা ঐ বিষয় যা সত্যের বিশুদ্ধ সাহায্য ও সহায়তা এবং ইসলামের বাণীকে সমুন্নত করার ওপরে প্রতিষ্ঠিত। এ জামাতের ভিত্তি প্রস্তর খোদাতাআলা স্বয়ং নিজ হস্তে রেখেছেন এবং এজন্যে জাতিসমূহকে তৈরী করা হয়েছে যারা শীঘ্র এসে মিলিত হবে। কেননা, ইহা ঐ সর্বশক্তিমান খোদার কাজ যার সামনে কোন কথা অসম্ভব নয়।.....পরিশেষে আমি দোয়ার সাথে শেষ করছি যে, যেসব ব্যক্তি এ ঐশী জলসার জন্যে সফর করেছেন খোদাতাআলা তাদের সাথী হোন আর তাদেরকে মহান পুরস্কারে ভূষিত করুন এবং তাদের ওপরে করুণা বর্ষণ করুন ও তাদের কষ্টসমূহ ও দুর্ভাবনার অবস্থা তাদের জন্যে সহজসাধ্য করে দেন এবং তাদের দুঃখ-কষ্ট মোচন করে দেন। প্রত্যেক কষ্ট থেকে তাদেরকে রক্ষা করেন এবং তাদের আশা-আকাংখার দুয়ারসমূহ খুলে দেন আর আখেরাত দিবসে তাঁর ঐ সব বান্দাদের সাথে তাদেরকে উত্থিত করেন যাদের ওপরে তাঁর অনুগ্রহ ও করুণাধারা বর্ষিত হয়েছে এবং তাদের শেষ যাত্রার পরে তাদের স্থলাভিষিক্ত বিদ্যমান থাকে। হে খোদা, হে মহামর্যাদাবান, প্রদাতা ও পরম দয়াময় খোদা এবং দুঃখ নিরসনকারী খোদা! এসব দোয়া কবুল করো আর আমাদেরকে আমাদের বিরুদ্ধবাদীগণের ওপরে উজ্জ্বল নিদর্শনের সাথে বিজয় দান করো। কেননা, সব শক্তি ও সামর্থ্যের অধিকারী তুমিই। আমীন সুম্মা আমীন" (মজমুয়া ইশ্‌তেহারাত ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৪১-৩৪৩)।

অনুবাদ : মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

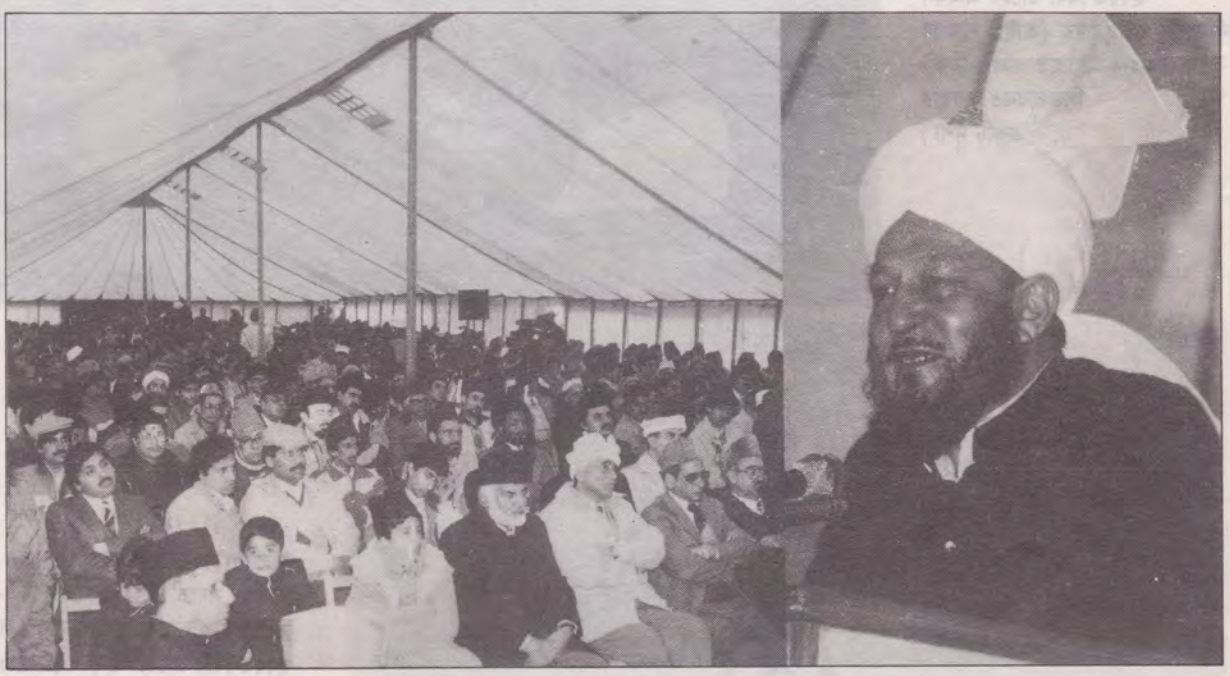

পশ্চিম আফ্রিকায় ঐতিহাসিক সফর শেষে প্রত্যাবর্তনের পর যুক্তরাজ্য জামাতের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ভাষণ দিচ্ছেন হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে'(আইঃ)

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর একটি মহান ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা

শেষ যুগের চিত্র বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেন যে, যখন দজ্জালের আবির্ভাব হবে, তখন দিনগুলোর দৈর্ঘের পরিমাণ সাধারণ দিনের দৈর্ঘের চেয়ে বেড়ে যাবে। অর্থাৎ পৃথিবীর কোন কোন স্থানে একটি দিনের দৈর্ঘের পরিমাণ হবে অন্যান্য স্থানের ৬ মাসের সমান। তিনি (সাঃ) ইঙ্গিত দেন যে, অসাধারণ অবস্থার কারণে মুসলমানদের ২৪ ঘন্টার হিসেব করে নামায আদায় করতে হবে। ইউরোপের সবচে' উত্তর অঞ্চল নরওয়ের নর্ড ক্যাপ নামক স্থানে গত ২৪শে জুন, ১৯৯৩ইং তারিখে যখন নিখিল বিশ্ব আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামাতের বর্তমান খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ) জুমুআর নামাযসহ পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাতে আদায় করেন তখন এ মহান ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ মর্যাদার সাথে পরিপূর্ণতা লাভ করে।

নরওয়ের নর্ড ক্যাপে নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের চতুর্থ খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ) গত ২৪শে জুন '৯৩ বা-জামাত নামাযে ইমামতি করছেন।

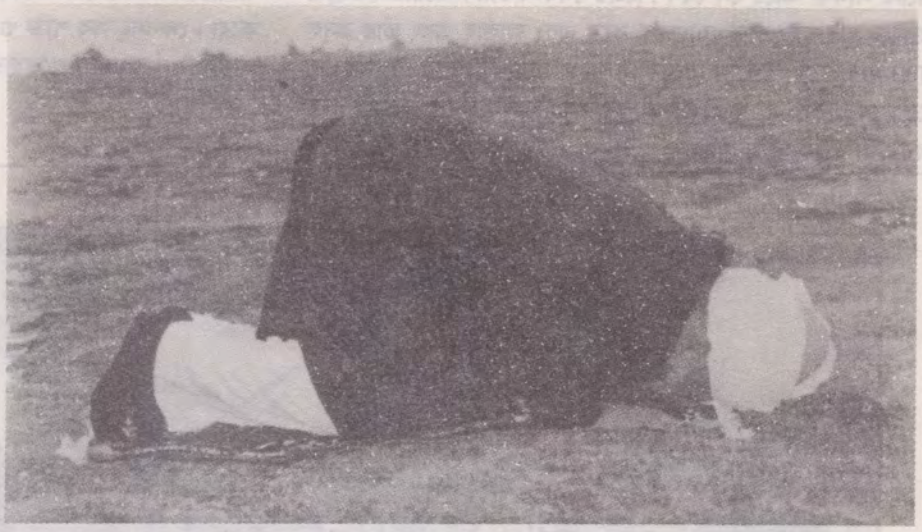

হযরত মির্যা তাহের আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) নামাযে মহান আল্লাহ্‌তাআলার নিকট সিজদাবনত অবস্থার একটি দৃশ্য।

ইউরোপ মহাদেশের নরওয়ের নর্ড ক্যাপের সবচে' উত্তর অঞ্চলের স্মৃতি-চিহ্নের নিকট জামাতের সদস্যবৃন্দ সহ হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ)-কে দেখা যাচ্ছে।

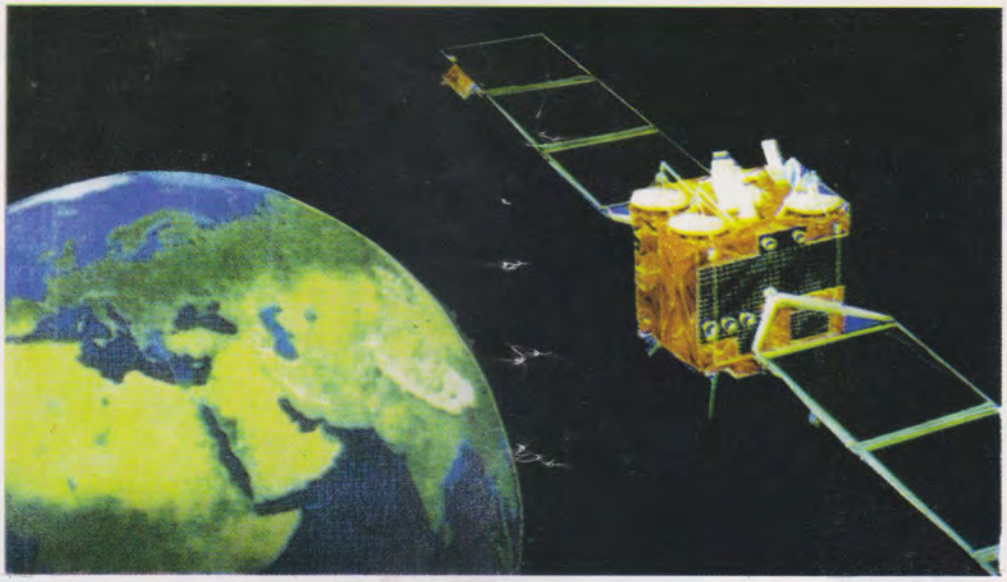

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

Muslim TV AHMADIYYA INTERNATIONAL

MTA AUDIO CHANNELS

* Main	: 6.50 MHz
* English	: 7.02 MHz
* Arabic	: 7.20 MHz
* Bangla	: 7.38 MHz
* French	: 7.56 MHz
* German	: 7.74 MHz
* Indonesian	: 7.92 MHz
* Turkee	: 8.10 MHz

আপনার বাড়ীতে এমটিএ MTA-এর সংযোগ নিন।
নিজেকে ও পরিবারকে অবক্ষয়মুক্ত রাখুন।

বিস্তারিত তথ্যের জন্যে যোগাযোগ করুন ঃ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
৪ বক্‌শী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

এমটিএ অহোরাত্রে
দর্শক যার বিশ্বে সর্বত্র

- এমটিএ MTA আন্তর্জাতিক স্যাটালাইট টেলিভিশন সর্বক্ষণ খাঁটি ইসলাম প্রচারে রত একমাত্র টিভি চ্যানেল।
- সারা বিশ্বে এই চ্যানেল ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পাশাপাশি পরিচ্ছন্ন সামাজিক, শিক্ষামূলক ও স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠানাদি প্রচার করে থাকে।
- এমটিএ MTA একমাত্র টিভি নেটওয়ার্ক যাতে মূল অডিও চ্যানেলসহ মোট ৮টি ভাষায় অডিও চ্যানেল বিদ্যমান।
- বর্তমানে এই চ্যানেল দৈনিক এক ঘন্টা বাংলাদেশের অনুষ্ঠানের পাশাপাশি চার বার বাংলায় বিশ্ব সংবাদ প্রচার করে চলেছে।
- প্রতিদিন হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (আইঃ)-এর সহিত প্রশ্নোত্তর সেশন 'লিকা-মাআল আরব' দেখুন।
- প্রতি শুক্রবার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭ টায় হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (আইঃ)-এর খুৎবাহ শুনুন।

এমটিএ MTA: ৫৭° ইষ্ট, ভিডিও ফ্রিকোয়েন্সী ৯৭৫, মূল অডিও ৬.৫০ মেগাহার্টস্। বাংলা অডিও ৭.৩৮ মে: হা:।

New Vol. N0. 59 o 14th Issue 31st January, 1998 Tk. 10.00

Fortnightly The AHMADI রেজিঃ নং-ডি, এ-১২

QUALITY IS OUR TRADITION

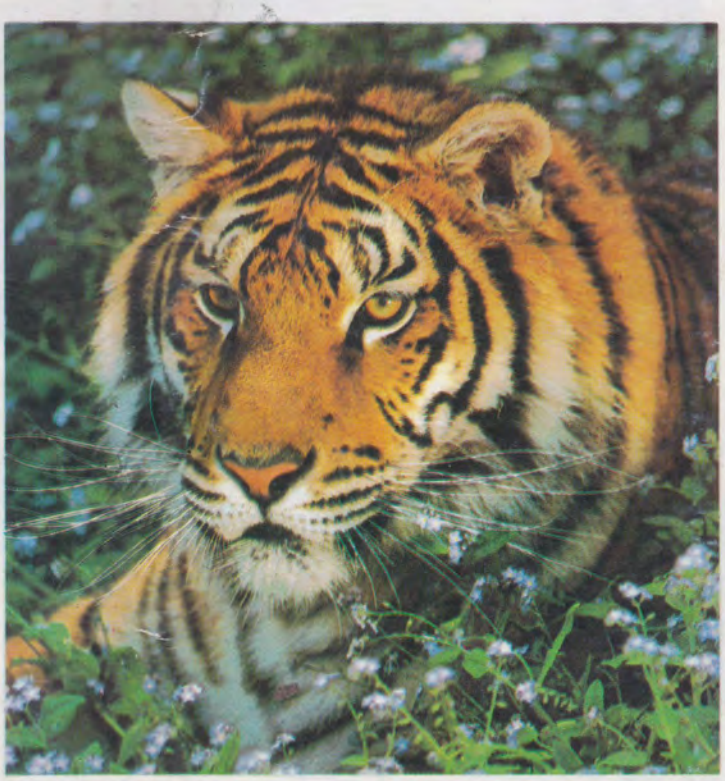

AMEGON

এমিকন

HEAD OFFICE : H-79/3, BLOCK-E, BANANI CHAIRMAN BARI, DHAKA-1213, BANGLADESH, TELEFAX : 880-2-884945, TEL : 605331

BRANCH OFFICE : 205, BAIZID BOSTAMI ROAD, BAIZID BOSTAMI , CHITTAGONG. PHONE : 682216

SPECIALIST IN ADVERTISING, DESIGN, PRINTING HOARDING, DECORATION, PLASTIC & METAL SIGN ARMY CRESTS, WOODEN & STEEL. FABRICATION WORK. SCULPTURE & MODELING.

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহ্‌মদীয়া আর্ট প্রেস, ৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। দূরালাপনী ঃ ৫০১৩৭৯, ৫০৫২৭২

সম্পাদক ঃ মকবুল আহমদ খান

Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh 4, Bakshibazar Road, Dhaka-1211
Phone : 501379, 505272